ইছলাহ

ইছলামী জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য ত্রৈমাসিক

শিরোনাম সমূহ

- শরী'য়তের দৃষ্টিতে 'ঈদে মীলাদুন্নাবী বা মীলাদ মাহ্ফিল
- পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- বিদ'আত পরিচিতি
- মীলাদ বিষয়ক কতিপয় সংশয় নিরসন
- প্রস্রাব-পায়খানার সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি ও একটি উপলব্ধি

সংখ্যা-০৪ | রাবী'উল আওয়াল- ১৪৩৫ হিজরী। মাঘ- ১৪২০ বাংলা। জানুয়ারি- ২০১৪ ইংরেজী। পৃষ্ঠা সংখা-১২ | শুভেচ্ছা মূল্য-০৭ টাকা

শরী'য়তের দৃষ্টিতে 'ঈদে মীলাদুন্নাবী বা মীলাদ মাহ্ফিল

মূল: ড. আশ্শাইখ ছা'য়ীদ ইবনু 'আলী ইবনু ওয়াহ্ফ আল ক্বাহ্ত্বানী (হাফিযাহুল্লাহ্)

আমাদের সমাজে বর্তমানে যেসব জঘন্য বিদ'আত অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বিদ্যমান, তন্মধ্যে অন্যতম হলো রাবী'উল আওয়াল মাসে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্মদিন পালন বা 'ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন।

এই বিদ'আত কর্মটি বিভিন্নভাবে পালিত হয়ে থাকে। কেউ কেউ এ (মীলাদুন্নাবী) উপলক্ষে সমবেত হয়ে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্ম-কাহিনী পাঠ করে থাকেন, কিংবা ওয়া'য-নাসীহাত এবং বিভিন্ন ধরনের ক্বাসীদাহ্ (গযল, কবিতা) আবৃত্তি করে থাকেন। কেউ কেউ এ উপলক্ষে সমবেত লোকদের মাঝে সেমাই, মিষ্টি ও হালুয়া বিতরণ করে থাকেন। অনেকে মাছজিদে আবার কেউ কেউ নিজ নিজ বাড়িতে এই মাহ্ফিলের আয়োজন করে থাকেন।

আবার অনেকে এমনও আছেন যারা মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠানকে শুধুমাত্র উপরোক্ত কার্যাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না, বরং তাতে তারা নানা ধরনের অবৈধ ও হারাম কাজ যেমন- নারী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ, নাচ-গান, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা, তাকে আহ্বান করা, তার সাহায্যে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করা ইত্যাদি বিভিন্ন রকম শির্কী কাজ-কর্ম করে থাকে।

এই মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান তা যেভাবেই পালন বা উদযাপন করা হোক না কেন, কিংবা যে কোন উদ্দেশ্যেই করা হোক না কেন, সর্বাবস্থায় এটি বিদ'আত ও নিষিদ্ধ গর্হিত কাজ। এটি উত্তম যুগের অনেক পরে ইছলামের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত একটি কাজ। চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে ফাত্বিমী গোত্রের তথাকথিত দাবিদার (যারা নিজেদেরকে ফাত্বিমাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা এর বংশধর বলে মিথ্যা দাবি করে) 'উবায়দী গোত্রের শী'আ শাসকগণ এবং তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম "আল মু'য়িয লি দ্বীনিল্লাহ্" নামক শাসক মিশরে এই বিদ'আত কর্মটি প্রবর্তন করে।

অতঃপর ৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা ৭ম হিজরী শতাব্দীর শুরুর দিকে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনু কাছীর ও ইবনু খালক্বান এর মতে ইরদীল শহরের শাসক মুযাফ্ফার আবূ ছা'ঈদ কুকুবুরী পুনরায় নব্য উদ্যমে এই বিদ'আতটি চালু করে। সে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় বিশাল অর্থ ব্যয় করে রাবী'উল আওয়াল মাসে মীলাদুন্নাবী (ﷺ) উপলক্ষে অত্যন্ত জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে থাকে। আর এভাবেই ক্রমান্বয়ে এই জঘন্য বিদ'আতটি মুছলিম সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

আল্লাহর ﷻ বাণী

ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- নিশ্চয় তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তাঁরা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল:- তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার 'ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকাল থাকবে। তবে (এই আদর্শের) ব্যতিক্রম হলো ইবরাহীমের উক্তি তাঁর পিতার প্রতি:- আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, যদিও তোমার উপকারের জন্যে আমি আল্লাহ্র নিকট কোন অধিকার রাখিনা। (ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীগণ বলেছিলেন) হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তো আপনারই উপর নির্ভর করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো আপনারই নিকট। (ছূরা আল মুমতাহিনাহ্- ৪)

পূর্ববর্তী এবং বর্তমান সময়ের প্রায় সকল হাক্ব্যানী 'উলামায়ে কিরাম 'ঈদে মীলাদুন্নাবী কিংবা মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান পালনকে নিম্নোক্ত দলীল ও সুস্পষ্ট কারণ সমূহের ভিত্তিতে বিদ'আত ও হারাম বলে অভিহিত করেছেন।

যে সকল দলীল ও সুস্পষ্ট কারণের ভিত্তিতে 'উলামায়ে কিরাম এটিকে বিদ'আত ও শরী'য়তে ইছলামিয়্যাহ্তে নিষিদ্ধ বলেছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি হলো নিম্নরূপ:-

১) এটি দ্বীনে ইছলামের মধ্যে (৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইছলামী শরী'য়তে "পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা" সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই চলে আসে সালাত প্রসঙ্গ। দ্বীনে ইছলামের দ্বিতীয় ভিত্তি হলো সালাত। শাহাদাতাইনের পরেই হলো সালাতের স্থান। মুছলমান এবং কাফিরের মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী বিষয় হলো সালাত। এটি ইছলামের অন্যতম একটি ভিত্তি। ক্বিয়ামাতের দিন (প্রত্যেক ঈমানদারের নিকট হতে) সর্বপ্রথম যে বিষয়টির হিসাব নেয়া হবে, সেটি হলো- সালাত। যদি বান্দাহ্র সালাত সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়, তাহলে তার অন্য সকল 'আমলও আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হবে। আর যদি তার সালাত প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহলে অন্য সকল 'আমলও প্রত্যাখ্যাত হবে। ক্বোরআনে কারীমে বিভিন্নভাবে সালাতের কথা উল্লেখ হয়েছে। কখনো সালাত ক্বায়িম করার কথা বলা হয়েছে। কখনো সালাতের ফযীলত ও তার ছাওয়াবের কথা বলা হয়েছে। কখনো ছাব্র (ধৈর্য্য) ও সালাতের কথা একসাথে উল্লেখ করে বিপদ-আপদে, দুঃখ-কষ্টে এ দু'টোর (ধৈর্য্য ও সালাত) মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। আর এসব কারণেই সালাত ছিল রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর চোঁখ শীতলকারী 'ইবাদত। সালাত হলো নাবীগণের ('আলাইহিমুছ্ ছালাম) অলঙ্কার আর নেক্কারদের (সৎকর্মশীলদের) পরিচায়ক বা নিদর্শন। সালাত হলো বান্দাহ্ ও রাব্বুল 'আলামীনের মাঝে যোগাযোগের মাধ্যম। বেহায়াপনা ও মন্দকাজ থেকে নিবৃতকারী বিষয় হলো সালাত।

দ্বীনে ইছলামে এই হলো যে সালাতের অবস্থান ও গুরুত্ব, সেই সালাত অপবিত্রতা ও নাপাকী থেকে শরী'য়ত নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী পানি অথবা মাটি দ্বারা যথাযথ পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত আদৌ সঠিক ও শুদ্ধ হয় না। আর একারণেই ফুক্বাহায়ে কিরাম (ইছলামী ফিক্বহ্ শাস্ত্রবিদগণ) তাদের ফিক্বহের গ্রন্থগুলো ত্বাহারাত অর্থাৎ "পবিত্রতা" অধ্যায় দিয়ে শুরু করতেন। আমরা দেখতে পাই যে, ইছলামী ফিক্বহের নির্ভরযোগ্য ছোট-বড় প্রায় সব গ্রন্থই পবিত্রতা অধ্যায় দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এছাড়া, যেহেতু শাহাদাতাইনের পরে ইছলামের অন্য সকল ভিত্তি সমূহের মধ্যে সালাতকেই প্রাধান্য দিয়ে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে, সুতরাং এই সালাত সঠিক-শুদ্ধ হওয়া যে বিষয়টির উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ সালাত সঠিক-শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে বিষয়টি শর্ত, সর্বাগ্রে সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুছলমানের উপর ফার্য।

সালাত সঠিক ও বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্ব শর্ত হলো- ত্বাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন। সালাতের চাবিকাঠি হলো- পবিত্রতা। হাদীছে বর্ণিত রয়েছে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- পবিত্রতা হলো নামাযের চাবি। (মুছনাদে ইমাম আহমাদ। তিরমিযী। আবূ দাঊদ)

অপবিত্রতা হলো নামাযের পথে অন্তরায়। এটি অপবিত্র ব্যক্তির উপর ঝুলন্ত একটি তালার ন্যায়। যখন সে অযূ করে নেয়, তখন সেই তালা খুলে যায়। মোটকথা, পবিত্রতা অর্জন হলো সালাতের অপরিহার্য শর্ত। (১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

ছালাফে সালিহীনের رضي الله عنهم অমূল্য কথা

ইমাম আবূ ইছহাক্ব আশ্শাত্বিবী বলেছেন:- নেক্কার আল্লাহ্ওয়ালা লোকদের অন্তর থেকে সর্বশেষ যে বিষয়টি বিদূরিত হয়ে যায়, সেটি হলো- নেতৃত্ব ও শাসন কর্তৃত্বের ভালোবাসা এবং নিজেকে প্রকাশ করার আগ্রহ।

(আল ই'তিসাম)

ইমাম আবূ না'য়ীম বলেছেন:- আল্লাহ্র শপথ! যারা ধ্বংস হয়েছে তারা কেবল নেতৃত্বের প্রতি ভালোবাসার কারণেই ধ্বংস হয়েছে।

(জামি'উ বয়ানিল 'ইলম- ১/৫৭০)

মীলাদ বিষয়ক কতিপয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তাঁর (রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর) জন্মদিনকে সাহাবায়ে কিরাম ﷺ 'ঈদ বা কোন অনুষ্ঠান পালনের দিন সাব্যস্ত করেননি। যদি এরূপ করা শরী'য়ত সম্মত হতো, তাহলে অবশ্যই তাঁরা তা বর্জন করতেন না।

২) যারা মীলাদুন্নাবী মাহ্ফিল বা 'ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করে থাকেন, তাদের দাবি হলো- যেহেতু অনেক দেশের অসংখ্য লোকেরা এ কাজটি করে থাকে, সুতরাং এটি বিদ'আত হতে পারে না। কেননা একসাথে এত লোক একটি বাত্বিল- ভ্রান্ত কাজ করতে পারে না।

তাদের এ দাবি ও সংশয়ের জবাবে আমরা বলব যে, যা কিছু রাছূলুল্লাহ্ ﷺ হতে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত, তা-ই হলো দলীল। আর রাছূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত রয়েছে যে, তিনি সাধারণভাবে বিদ'আত থেকে (দ্বীনের মধ্যে যে কোন রকম বিদ'আত করতে) নিষেধ করছেন। যেহেতু মীলাদ মাহ্ফিল বা 'ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করা রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিষেধকৃত বিদ'আতী কর্মকান্ডের অন্তর্ভুক্ত তথা বিদ'আত- তাই রাছূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত দলীলের ভিত্তিতে এ কাজটি নিষিদ্ধ। আর মানুষের কোন কাজ যদি সুস্পষ্ট দলীলের বিপরীত হয়ে থাকে, তাহলে তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যদিও সেটা অনেক লোক বা অধিকাংশ লোক করে থাকে। এ বিষয়ে ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তাহলে তাঁরা আপনাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। (ছূরা আল আন'আম- ১১৬)

সুতরাং অনেকে এ কাজটি করছে বলেই তা সঠিক হতে পারে না। তাছাড়া প্রত্যেক যুগে এমনও অনেক লোক রয়েছেন যারা এই বিদ'আতী কাজটিকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছেন, এবং এটা যে বাত্বিল ও ভ্রান্ত একটি কাজ তা সুস্পষ্টভাবে দলীল-প্রমাণসহ মানুষের সামনে তুলে ধরছেন।

অতএব সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর বা সত্য জানার পরও যারা এই ভ্রান্ত বিদ'আতটি পুনরুজ্জীবিত বা চালু করার চেষ্টা করবে, তাদের 'আমলকে কোনভাবেই দলীল গণ্য করা যাবে না এবং তাদের অনুসরণ করা যাবে না।

রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্মদিন উপলক্ষে 'ঈদ উদযাপন অথবা জন্মদিন স্মরণে মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান বা মীলাদ মাহ্ফিলকে অসংখ্য হাক্বানী 'উলামায়ে কিরাম বিদ'আত আখ্যায়িত করেছেন এবং নিজ নিজ কিতাবাদিতে এ কাজটিকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন- শাইখুল ইছলাম ইবনু তাইমিয়াহ্ রাহিমাহুল্লাহ্, তিনি তার "ইক্বতিযাউস্ সিরাত্ব আল মুছতাক্বীম" গ্রন্থে, ইমাম আবূ ইছহাক্ব আশ্ শাত্বিবী রাহিমাহুল্লাহ্ তার "আল ই'ত্বিসাম" গ্রন্থে, ইবনুল হাজ্জ রাহিমাহুল্লাহ্ তার "আল মাদখাল গ্রন্থে" শাইখ মুহাম্মাদ বাশীর আশ্ শাহ্ছাওয়ানী আল হিনদী তার "সিয়ানাতুল ইনছান" গ্রন্থে- এ কাজটি যে বিদ'আত ও ভ্রান্ত একটি কাজ, তা দলীল-প্রমাণসহ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। আরো যেসব 'উলামায়ে কিরাম এ বিষয়টিকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেছেন- তন্মধ্যে রয়েছেন- শাইখ তাজুদ্দীন 'আলী ইবনু 'উমার আল লাখমী, ছায়্যিদ মুহাম্মাদ রাশিদ রেজা, শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আল আশ্শাইখ, শাইখ 'আব্দুল 'আযীয ইবনু বায (রাহিমাহুমুল্লাহু আজমা'য়ীন) প্রমুখ।

তাছাড়া এখনো অনেক 'উলামায়ে কিরাম প্রতি বছর যখনই এই বিদ'আতটি পালনের সময় আসে, তখনই দলীল-প্রমাণসহ এর বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা ও ম্যাগাজিনে লেখালেখি করে থাকেন।

৩) যারা মীলাদ মাহ্ফিল বা 'ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করে থাকে, তাদের দাবি হলো- যেহেতু এটি পালনের দ্বারা রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, সুতরাং তা বিদ'আত হতে পারে না।

কিন্তু তাদের এ দাবি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বরং তা প্রত্যাখ্যাত। কেননা রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর কথা স্মরণ করা বা করিয়ে দেয়া- এটাতো আল্লাহ প্রবর্তিত পন্থা; আযান, ইক্বামাত, খুতবাহ্, তাশাহ্হুদ, দুরূদ ও হাদীছ পাঠ এবং রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর রিছালাতের যথাযথ অনুসরণের দ্বারাই হয়ে থাকে। এ কাজগুলো তো বছরে একবার করা হয় না বরং প্রত্যেক দিন প্রত্যেক রাত বারবার করা হয়ে থাকে এবং সবসময় চলতে থাকে। সুতরাং এসব কাজের মাধ্যমে প্রত্যেক দিন প্রতিনিয়ত রাছূলুল্লাহ্কে (ﷺ) স্মরণ করা হচ্ছে। তাহলে ঘটা করে বছরে একদিন তাঁকে স্মরণ করা বা করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হবে কেন? কেইবা এর অনুমতি দিয়েছে? আল্লাহ ﷻ তো এরূপ কিছু করার অনুমতি দেননি।

৪) যারা মীলাদ মাহ্ফিল বা 'ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করে, তাদের কেউ কেউ বলে যে- এ কাজটি বিদ'আতে হাছানাহ বা উত্তম বিদ'আত। কেননা এর দ্বারা নাবীকে পৃথিবীতে পাঠানোর জন্য আল্লাহ্র (ﷻ) প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। কিন্তু তাদের এ কথাটি মোটেও সঠিক নয়। দ্বীনী বিষয়ে বিদ'আতের মধ্যে উত্তম বলতে কিছু নেই। রাছূলুল্লাহ্ ﷺ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলে গেছেন:- অর্থ- যে আমাদের এ বিষয়ে (দ্বীনী বিষয়ে বা দ্বীনের মধ্যে) নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, তাহলে সেটা হবে প্রত্যাখ্যাত।

এছাড়া আরো কথা হলো- যদি তাদের ধারণা মতে এর দ্বারা (মীলাদ মাহ্ফিল বা 'ঈদে মীলাদুন্নাবী পালনের দ্বারা) আল্লাহ্র (ﷻ) শোক্র (কৃতজ্ঞতা) আদায় করা হতো, তাহলে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে এসে এতো দেরিতে আল্লাহ্র শোক্র আদায়ের এ কাজটি শুরু হলো কেন? শ্রেষ্ঠ যুগের শ্রেষ্ঠ লোকেরা; সাহাবায়ে কিরাম, তাবি'য়ীন ও তাব'য়ে তাবি'য়ীন ﷺ তো এ কাজটি (মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন) করেননি। অথচ তারা ছিলেন রাছূলের (ﷺ) প্রতি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা পোষণকারী, উত্তম কাজ সম্পাদনের প্রতি সবচেয়ে বেশি আকাঙ্খা পোষণকারী এবং আল্লাহ্র শোক্র আদায়ে প্রচন্ড আগ্রহী।

তাহলে কি যারা মীলাদ পালনের বিদ'আত আবিষ্কার করেছেন বা যারা মীলাদুন্নাবী পালন করে থাকেন, তারা সাহাবায়ে কিরাম, তাবি'য়ীন ও তাব'য়ে তাবি'য়ীন ﷺ থেকেও বেশি হিদায়াত প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্র (ﷻ) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে তাদের চেয়েও বেশি আগ্রহী ও অগ্রগামী ? অবশ্যই না।

৫) যারা মীলাদ মাহ্ফিল বা 'ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করে থাকেন, তাদের দাবি হলো যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতি অন্তরে ভালোবাসা থাকার দরুনই তাঁর জন্মদিন পালন করা হয়। মীলাদুন্নাবী মাহ্ফিল বা 'ঈদে মীলাদুন্নাবী পালনের মাধ্যমে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আর যেহেতু আল্লাহ্র রাছূলের (ﷺ) প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন বা প্রকাশ করা বৈধ এবং শরী'য়ত সম্মত কাজ, তাই মীলাদ মাহ্ফিল বা 'ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করা বিদ'আত হতে পারে না, বরং তা জায়িয ও শরী'য়ত সম্মত ছাওয়াবের কাজ।

মীলাদ পালনকারীদের এই দাবি ও সংশয়ের জাওয়াবে আমাদের কথা হলো- হ্যাঁ, অবশ্যই নিজের প্রাণ, পিতা, পুত্র এবং সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসার চেয়েও রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতি অধিক ভালোবাসা পোষণ করা এবং তাকে মনে-প্রাণে ভালোবাসা প্রত্যেক মুছলমানের উপর ওয়াজিব। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, আমরা তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করতে যেয়ে এমন কিছু নতুন আবিষ্কার করব, যা ক্বোরআন-ছুন্নাহ্তে নেই, কিংবা তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে যেয়ে নতুন এমন কোন বিষয় উদ্ভাবন বা সৃষ্টি করব, যে বিষয়টি ইছলামী শরী'য়ত আমাদের জন্য অনুমোদন বা প্রবর্তন করেনি। প্রকৃত অর্থে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতি ভালোবাসা পোষণের বা রাছূলুল্লাহ্কে (ﷺ) ভালোবাসার দাবি হলো- তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা। এটাই হলো রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতি ভালোবাসার সবচেয়ে বড় বহিঃপ্রকাশ। যেমন- অতি সুপ্রসিদ্ধ একটি কবিতায় বলা হয়েছে:- যার অর্থ হলো- যদি তোমার ভালোবাসা সত্য হতো, তাহলে অবশ্যই তুমি তার আনুগত্য করতে। নিশ্চয়ই যে যাকে ভালোবাসে, সে তার আনুগত্য করে থাকে।

তাই প্রকৃত অর্থে রাছূলুল্লাহ্কে (ﷺ) ভালোবাসার বা তাঁর প্রতি মুহাব্বাত পোষণের দাবি ও চাহিদা হলো- তাঁর ছুন্নাতকে পুনর্জীবিত করা, সুদৃঢ়ভাবে তা অবলম্বন করা ও আঁকড়ে ধরা এবং সাথে সাথে ছুন্নাহ্ বিরোধী যাবতীয় কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর ছুন্নাহ্ বিরোধী সকল কিছুই হলো চরম নিন্দনীয় বিদ'আত এবং আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাছূলের (ﷺ) প্রকাশ্য-সুস্পষ্ট নাফরমানী। যেহেতু মীলাদ মাহ্ফিল বা 'ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করা হলো ছুন্নাহ্ বিরোধী কাজ, তাই এ কাজটি হলো আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাছূলের (ﷺ) প্রকাশ্য নাফরমানী এবং চরম নিন্দনীয় একটি বিদ'আত।

জেনে রাখা আবশ্যক যে, কেবলমাত্র ভালো নিয়্যাত বা উদ্দেশ্য কোন বিদ'আতকে বৈধতা দিতে পারে না। কেননা দ্বীনে ইছলামের যাবতীয় কাজের বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা দুটি মৌলিক বিষয় তথা ভিত্তির উপর নির্ভরশীল। একটি হলো- ইখলাস। আর দ্বিতীয়টি হলো- রাছূলের অনুসরণ। ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে, তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে, তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (ছূরা আল বাক্বারাহ্- ১১২)

"নিজেকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা" এটাই হলো ইখলাস বা নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা তথা নিয়্যাত-কে আল্লাহ্র জন্য খাঁটি করা। আর "সৎকর্মশীল হওয়া বা সৎকর্ম করা" এটা হলো ইত্তিবা' অর্থাৎ রাছূলের (ﷺ) অনুসরণ তথা ছুন্নাহ্ অনুসরণ করা।

যাই হোক, উপরোক্ত আলোচনার সারকথা হলো- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্মদিন স্মরণে মীলাদ মাহ্ফিল করা বা 'ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করা, তা যেভাবেই হোক না কেন এবং যত ভালো উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, রাছূলের (ﷺ) প্রদর্শিত পন্থা বহির্ভূত হওয়ার কারণে এটি নিষিদ্ধ, প্রত্যাখ্যাত ও বিদ'আত।

তাই প্রত্যেক মুছলমানের উপর ওয়াজিব, মীলাদ মাহ্ফিলের এই বিদ'আতসহ দ্বীনের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত যাবতীয় বিদ'আত বর্জন করা এবং সকল প্রকার বিদ'আত থেকে দূরে থাকা। প্রত্যেক মুছলমানের উপর ওয়াজিব- রাছূলুল্লাহ্র (ﷺ) ছুন্নাতকে সমাজে পুনর্জীবিত করা; ছুন্নাতের চর্চা-অনুশীলনে ব্যস্ত থাকা এবং তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বনের প্রতি মনোযোগী হওয়া। মীলাদ মাহ্ফিলের বিদ'আত কিংবা অন্যান্য বিদ'আত যারা সমাজে চালু করে, চর্চা করে ও বিদ'আতের পক্ষে সাফাই গায়, তাদের সংখাধিক্য দেখে কোন মুছলমান যেন কোন অবস্থাতেই বিভ্রান্ত ও প্রতারিত না হয়। কেননা এই প্রকৃতির (যারা বিদ'আত চর্চা করে এবং বিদ'আতের পক্ষে সাফাই গায়) লোকদের নিকট ছুন্নাতের চেয়ে বিদ'আতই হলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই তারা ছুন্নাতের পরিবর্তে বিদ'আতকে সমাজে চালু ও প্রতিষ্ঠিত করার প্রতি বেশি মনোযোগী হয়ে থাকে। এমনকি তাদের অনেককে দেখা যায়, তারা রাছূল ﷺ এর ছুন্নাতকে কোনরূপ গুরুত্ব প্রদান করে না, বরং ছুন্নাতের প্রতি চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করে থাকে। আর যাদের এই অবস্থা, তাদের অনুকরণ বা অনুসরণ করা তো কোন অবস্থাতেই জায়িয বা বৈধ হতে পারে না, যদিও তারা সংখ্যায় অনেক বেশি হয়ে থাকে। **অনুসরণ ও অনুকরণ করা হবে কেবল ছালাফে সালিহীন ও তাদের প্রকৃত অনুসারীদের, যারা ছুন্নাহ্ তথা রাছূলুল্লাহ্ ৎ এর প্রদর্শিত ও অনুসৃত পথ অনুসরণ করে চলেছেন, যদিও তাঁরা সংখ্যায় অনেক কম হয়ে থাকেন। কেননা, মানুষ দিয়ে সত্য চেনা যায় না, বরং সত্য দিয়ে মানুষ চেনা যায় (অর্থাৎ মানুষ দিয়ে সত্য যাচাই করা যায় না, বরং সত্য দিয়ে মানুষ যাচাই করতে হয়)।**

রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- অতঃপর নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। তাই তোমাদের উপর ওয়াজিব হলো- আমার ছুন্নাহ্ এবং আমার পরে হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদাহ্র ছুন্নাহ্ (অনুসৃত পথ) অনুসরণ-অবলম্বন করা। তোমরা এটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো, মাড়ি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরো এবং তোমরা নতুন আবিষ্কৃত বিষয়াদী (দ্বীনের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত বিষয়াদী তথা বিদ'আত) থেকে বেঁচে থাকো, কেননা প্রতিটি বিদ'আত হলো পথভ্রষ্টতা।

(মুছনাদে ইমাম আহ্মাদ- ১৬৬৯২। জামে' তিরমিযী- ২৬৭৬)

মতবিরোধ (দ্বীনী বিষয়ে মতবিরোধ বা মতানৈক্য) দেখা দিলে আমরা কার বা কিসের অনুসরণ করব, উপরোক্ত হাদীছে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সে বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। সাথে সাথে তিনি একথাও স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, ছুন্নাহ্ বিরোধী যে কোন কথা বা কাজই হলো বিদ'আত। আর প্রতিটি বিদ'আতই হলো গুমরাহী বা ভ্রষ্টতা।

এই হাদীছের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা যদি 'ঈদে মীলাদুন্নাবী বা মীলাদুন্নাবী মাহ্ফিলের বিষয়টি দেখি, তাহলে আমরা রাছূলুল্লাহ্ ﷺ কিংবা তার খুলাফায়ে রাশিদাহ্র ছুন্নাহ্তে বিষয়টির (মীলাদুন্নাবী মাহ্ফিল বা মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান পালনের) কোন অস্তিত্ব বা ভিত্তি খুঁজে পাই না। তাই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, এটি দ্বীনের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত একটি বিষয় এবং পথভ্রষ্টকারী একটি বিদ'আত।

উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত মূলনীতিটি (অর্থাৎ কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে রাছূল ﷺ এর ছুন্নাহ্ এবং তাঁর পরে খুলাফায়ে রাশিদাহ্র ছুন্নাহ্ অনুসরণ ও অবলম্বন করা আবশ্যক -এই মুলনীতিটি) ক্বোরআনে কারীম দ্বারাও প্রমাণিত। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে যাও, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাছূলের প্রতি প্রত্যর্পণ করো- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাকো। এটাই মঙ্গলজনক এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। (ছূরা আন্ নিছা- ৫৯)

আয়াতে উল্লেখিত "আল্লাহ্র প্রতি প্রত্যর্পণ" এর অর্থ হলো- আল্লাহ্র কিতাব; ক্বোরআনে কারীমের দিকে ফিরে যাওয়া। আর "রাছূলের প্রতি প্রত্যর্পণ" এর অর্থ হলো- তাঁর (রাছূলের) জীবদ্দশায় রাছূলের কাছে আর তাঁর (রাছূলের) মৃত্যুর পরে তাঁর ছুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়া। মোটকথা, ক্বোরআন আর ছুন্নাহ্ই হলো বিরোধের সময় প্রত্যর্পণ বা ফিরে যাওয়ার স্থল।

যেহেতু মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান একটি বিরোধপূর্ণ বিষয়, সুতরাং ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্তে বর্ণিত উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে আমরা যদি 'ঈদে মীলাদুন্নাবী বা মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিয়ে ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্র কাছে যাই, তাহলে সেখানে এর কোন বৈধতা (বৈধতা তো দূরের কথা অস্তিত্বই) পাওয়া যায় না। বরং সেখানে আমরা রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর এই সুস্পষ্ট নির্দেশটি দেখতে পাই:- অর্থ- যে ব্যক্তি আমাদের এই বিষয়ে (দ্বীনে বা শরী'য়তে) এমন কিছু নতুন আবিষ্কার (প্রবর্তন) করল যা তার (দ্বীনে ইছলামের বা শরী'য়তে ইছলামিয়্যাহ্র অর্থাৎ ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্র) অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহলে তা হবে প্রত্যাখ্যাত।

তাই প্রত্যেক মুছলমানের উপর ওয়াজিব- 'ঈদে মীলাদুন্নাবী বা মীলাদ মাহ্ফিল পালনের বিদ'আতকে প্রত্যাখ্যান করা এবং এর থেকে দূরে থাকা। আর যারা তা পালন করে থাকেন কিংবা এটাকে উত্তম কাজ বলে মনে করেন, তাদের উপর ওয়াজিব হলো- এ কাজটি পরিপূর্ণরূপে বর্জন করা, সাথে সাথে আল্লাহ্র (ﷻ) নিকট এই কাজ থেকে এবং আরো যতো বিদ'আত রয়েছে, সেসব থেকে তাওবাহ্ করা। আর এটাই হলো প্রকৃত সত্যান্বেষী ঈমানদারের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য।

পক্ষান্তরে দলীল-প্রমাণ পাওয়ার পরও যে ব্যক্তি অহংকার প্রদর্শন করবে এবং সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে তার হিসাব মহান পালনকর্তার নিকট অবশ্যই পাবে। আমরা আল্লাহ্র (ﷻ) নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কিতাব ও তাঁর রাছূলের ছুন্নাহ্ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকার তাওফীক্ব দান করেন।

আল্লাহ্র পক্ষ হতে সালাত, ছালাম, কল্যাণ ও বারাকাত বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাগণের প্রতি।

সূত্রঃ- ১। হুকমুল ইহ্তিফাল বি যিকরিল মাওলিদিন্ নাবাওয়ী।

বিদ'আত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নব-উদ্ভাবিত বা আবিষ্কৃত কোন পন্থা বা বিষয়- শরী'য়তে ইছলামিয়াহ্তে যার কোন ভিত্তি কিংবা পূর্ব উদাহরণ বা সদৃশ নেই; দ্বীনে ইছলামে এরূপ নতুন বা প্রথম আবিষ্কৃত প্রতিটি বিষয় বা পন্থাই হলো- বিদ'আত। তবে যেসব বিষয়ের সুস্পষ্ট ভিত্তি শরী'য়তে রয়েছে; যেগুলো দ্বীনের মধ্যে প্রথম বা নব-আবিষ্কৃত নয় বরং ইছলামে যেসব বিষয়ের সদৃশ ও পূর্ব উদাহরণ রয়েছে, সেসব বিষয় বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত নয়। এগুলোকে বিদ'আত বলা যাবে না। যেমন- সার্ফ্, নাহ্উ, শব্দার্থ বা ভাষাজ্ঞান, উসূলে ফিক্বহ্, উসূলে দ্বীন ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞান যেগুলোর দ্বারা ইছলামী শরী'য়তের খিদমাত করা হয়, সেসব বিষয় বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত নয় এবং ওগুলোকে বিদ'আত বলা যাবে না। কেননা ইছলামী শরী'য়তে এগুলোর সুস্পষ্ট ভিত্তি ও দলীল রয়েছে।

এ পর্যায়ে কেউ যদি প্রশ্ন তোলেন যে, যদিও এসব জ্ঞানের ভিত্তি শরী'য়তে রয়েছে, তবে এসব বিষয়ে এভাবে কিতাব সংকলন করা- এটা তো বিদ'আত। কেননা এভাবে কিতাব সংকলনের পক্ষে শরী'য়তে তো কোন দলীল নেই।

তাহলে আমরা তার উত্তরে বলব:- আপনি (প্রশ্ন উত্থাপনকারী) যেভাবে বলছেন, তাতে তো এসব বিষয় এমনকি ক্বোরআনে কারীম একত্রকরণ ও সংকলন করাও জঘন্য কাজ তথা বিদ'আত সাব্যস্থ হয়ে যায়। অথচ এরূপ দাবী ("ক্বোরআনে কারীম সংকলন বা একত্রকরণ করা, নাহ্উ, সার্ফ, উসূলে হাদীছ, উসূলে ফিক্বহ ইত্যাদি-ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্ পঠন-পাঠন ও সঠিকভাবে বুঝার জন্য সহায়ক ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদী গ্রন্থনা ও সংকলন করা বিদ'আত") যে সম্পূর্ণ অবান্তর, ভিত্তিহীন ও বাতিল দাবি, এ বিষয়ে মুছলিম উম্মাহ্র মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই বরং এতদ্বিষয়ে সকলেরই ইজমা' বা ঐকমত্য রয়েছে। সুতরাং অন্য কোন দলীল যদি নাও থাকে, তবুও কেবলমাত্র উম্মাতের ইজমা' এর ভিত্তিতে ক্বোরআন, ছুন্নাহ্ এবং এগুলো সঠিকভাবে জানা ও বুঝার জন্য প্রকৃত অর্থে সহায়ক যেসব জ্ঞান-বিজ্ঞান রয়েছে, সেগুলো সংকলন ও গ্রন্থনা শুধু জায়িয-ই নয় বরং তা অতি প্রয়োজনীয়ও বটে।

মাঝে মধ্যে যারা এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থনা ও সংকলনকে বিদ'আত বলেছেন, মূলত: ছুন্নাত ও বিদ'আত সম্পর্কে তাদের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে তারা এরূপ বলেছেন। তাদের কথা মোটেও ধর্তব্য নয়। **তবে অনেকেই রূপক অর্থে এটাকে বিদ'আত বলেছেন। যেমন- রামাযানে জামা'আতবদ্ধ হয়ে তারাওয়ীহের সালাত আদায়কে 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব ﷺ বিদ'আত বলেছিলেন। অথচ প্রকৃত অর্থে এটি আদৌ বিদ'আত ছিল না। কেননা রাছূলুল্লাহ ﷺ নিজেই সাহাবায়ে কিরামগণকে (ﷺ) নিয়ে মাছজিদে জামা'আতবদ্ধ হয়ে তারাওয়ীহের সালাত আদায় করেছেন।**

উপরে বিদ'আতের সংজ্ঞায় বর্ণিত **"যেটি বাহ্যিকভাবে শরী'য়ত প্রবর্তিত পথ বা বিষয় সদৃশ মনে হয়"** বাক্যটি দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, বাহ্যিকভাবে শরী'য়ত প্রবর্তিত বিষয়াদির সাথে কোন সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য নেই, এমন সব বিষয় বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত নয় এবং সেগুলোকে বিদ'আত বলা যাবে না। (যেমন, প্রাণীর ছবি ব্যতীত রং-বেরংয়ের চাটাই বা জায়নামাযের উপর সালাত আদায় করা, রামাযানে পরিমিত পরিমাণে বিভিন্ন রকম হালাল ইফতারী আয়োজন করা, সাদাক্বাহ্ বা অর্থ-সম্পদের যাকাত আদায়ে নতুন নোট ব্যবহার করা, বিমানে চড়ে হাজ্জের ছফর করা ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো যদিও দ্বীনের মধ্যে অর্থাৎ দ্বীনী বিষয়ে নব-আবিষ্কৃত, তবে শরী'য়ত প্রবর্তিত তথা দ্বীনী কোন বিষয়ের সাথে এসবের বাহ্যিক কোন সাদৃশ্যতা বা মিল না থাকায় এগুলোকে বিদ'আত বলা যাবে না।) {এই অংশটুকু বাংলা অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত} কেননা এগুলো হলো স্বাভাবিক রীতি-প্রথা ও নিছক জাগতিক কর্মকান্ড।

আর বাস্তবে শরী'য়ত পরিপন্থি হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন বিষয় বাহ্যিকভাবে দ্বীনী কোন বিষয়ের সদৃশ বা তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে সেটি বিদ'আত বলে গণ্য হবে। যেমন- কেবল দাঁড়িয়ে থেকে রোযা পালনের মানত

করা, সব কিছু বাদ দিয়ে নির্বিঘ্নে 'ইবাদত পালনের জন্য নপংসুক হয়ে যাওয়া, শরী'য়ত সম্মত কোন কারণ ছাড়াই বিশেষ কোন খাবার বা পোশাক বেছে নেয়া এবং অন্যান্য সব খাবার বা পোষাক বর্জন করা, সম্মিলিতভাবে উচ্চ আওয়াযে দু'আ-দুরূদ বা যিক্‌র-আযকার করা, শরী'য়তে যেসব দিন, তারিখ বা সময়ের জন্য বিশেষ কোন 'ইবাদত নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি এমন কোন দিন, তারিখ বা সময়ের জন্য বিশেষ কতক 'ইবাদত নির্দিষ্ট করে নেয়া। যেমন-বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার রাত্রকে যিক্‌র-আযকার ও সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া। এমনিভাবে শরী'য়তে যেসব 'ইবাদতের জন্য বিশেষ কোন দিন, তারিখ বা সময় নির্ধারণ করা হয়নি, এমন কোন 'ইবাদতের জন্য কোন দিন, তারিখ বা সময় নির্দিষ্ট করে নেয়া। যেমন- ১৫ই শা'বানকে রোযা পালনের জন্য এবং ১৪ই শা'বান দিবাগত রাতকে বিশেষ কিছু 'ইবাদত ও সালাতের জন্য নির্ধারণ করে নেয়া, এ সবই হলো- বিদ'আত। কেননা এগুলো হলো দ্বীনে ইছলামের মধ্যে শরী'য়ত পরিপন্থি এমন কতক কাজ, যেগুলো বাহ্যিকভাবে দ্বীনী তথা শরী'য়ত প্রবর্তিত বিষয়াদির সদৃশ বা অনুরূপ বিষয় ও কর্ম বলে মনে হয়।

মূলত: বিদ'আত আবিষ্কারকারী বিদ'আত আবিষ্কার বা প্রবর্তন করে থাকে এই উদ্দেশ্যে, যাতে করে বিদ'আতকে ছুন্নাতের রূপে রূপায়িত করে এর প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে প্রতারিত করা যায় কিংবা বিদ'আত কর্মটি ছুন্নাতের সদৃশ হওয়ার দরুন সাধারণ মানুষ যাতে ছুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্য সহজে নিরূপণ করতে না পেরে বিদ'আত অনুসরণ করে এবং বিভ্রান্ত হয়।

কারণ, সাধারণত মানুষ দ্বীনী বিষয়ে শরী'য়তসিদ্ধ (শরী'য়ত প্রবর্তিত) বিষয়ের অনুরূপ বলে মনে হয় না- এমন কোন পথ অনুসরণ করতে চায় না। কেননা সে জানে যে, ছুন্নাতের সদৃশ নয় এমন কোন বিষয় অনুসরণ করে সে কোন কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, কোন অনিষ্টও দূর করতে পারবে না এবং এরূপ বিষয়ে কেউ তাকে সমর্থনও করবে না।

আর এ কারণেই বিদ'আত চর্চাকারী তার বিদ'আতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এমন কোন বিষয়ের আশ্রয় নেয়, যে বিষয়টি বাহ্যত: দ্বীনী বা শরী'য়ত সম্মত বলে মনে হয়। প্রয়োজনে সে নেক্‌কার লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ বা সুপরিচিত মর্যাদা সম্পন্ন কারো অনুসরণের দোহাই দিয়ে নিজের আবিষ্কৃত বিদ'আতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

দেখুন! জাহিলিয়্যাত যুগের 'আরবগণ মিল্লাতে ইবরাহীম-কে (ইবরাহীম ﷺ এর অনুসৃত দ্বীনকে) পরিবর্তন করে নতুন যেসব পন্থা বা বিষয় আবিষ্কার করেছিল, সেগুলোর জন্য (তাদের নব-আবিষ্কৃত বিষয়াদিকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য) কী ধরনের ব্যাখ্যা ও যুক্তি দাঁড় করিয়েছিল। তারা তাদের আবিষ্কৃত শির্‌কী পন্থার পক্ষে তথা মূর্তি ও দেব-দেবীর পূজা করার পক্ষে বলেছিল:- অর্থাৎ- আমরা তাদের 'ইবাদত কেবল এজন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়। (ছূরা আয্ যুমার- ৩)

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শির্‌কের আবির্ভাব বা উৎপত্তির ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, মানুষের ফিত্বরাতী অর্থাৎ স্বভাবজাত ধর্ম ইছলামকে বাদ দিয়ে তাদের মধ্যে শির্‌ক্‌কে বাজারজাত করার জন্য অভিশপ্ত ইবলিছ শির্‌কের বিষয়টিকে ধর্মীয় আঙ্গিকে মানুষের কাছে উপস্থাপন করেছিল। তাদেরকে ক্বাওমে নূহ্ এর পাঁচজন নেক্‌কার আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের নাম দিয়ে বলেছিল যে, তোমরা এদের মূর্তি বা ছবি সামনে নিয়ে আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করতে থাকো, এতে করে আল্লাহ্‌র 'ইবাদতের প্রতি তোমাদের মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে। আর এভাবেই পর্যায়ক্রমে সে তাদেরকে উক্ত পাঁচজন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের ছবি বা মূর্তির 'ইবাদতে লিপ্ত করে ফেলে।

জাহিলিয়্যাত যুগের মাক্কাহ্‌বাসীগণ 'আরাফাহ্-তে অবস্থানকে বর্জন করেছিল এই যুক্তি-বলে যে, হারাম শরীফ (মাক্কাহ্ মুকাররামাহ্) ছেড়ে বাহিরে গিয়ে অবস্থান করা হলে হারাম শরীফের প্রতি অসম্মান প্রদর্শিত হবে।

উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহ্‌র ত্বাওয়াফ করার পিছনে তারা যুক্তি দাঁড় করিয়েছিল যে, আমরা যে পোশাক বা কাপড় পরিধান করে আল্লাহ্‌র নাফরমানী বা গুনাহের কাজ করেছি, সেই কাপড় গায়ে দিয়ে আমরা আল্লাহ্‌র ঘর ত্বাওয়াফ করতে পারি না।

এভাবে তারা তাদের নব-আবিষ্কৃত বিভিন্ন বিষয়াদী অর্থাৎ বিদ'আতকে বৈধ করার জন্য বাহ্যিকভাবে এমন অনেক ব্যাখ্যা ও যুক্তি প্রদর্শন করেছে, যেগুলো দৃশ্যতঃ ধর্মীয় ও শরী'য়ত সম্মত বলে মনে হয়। যদিও প্রকৃত অর্থে সেগুলো আদৌ ধর্মীয় বা শরী'য়ত সম্মত কোন ব্যাখ্যা বা যুক্তি নয়।

সুতরাং কাফির-মুশরিকরা যেখানে নিজেদের নতুন আবিষ্কৃত তথা বিদ'আতী পন্থা বা বিষয়াদীকে বৈধতা দেয়ার জন্য সেটাকে ধর্মীয় আঙ্গিকে উপস্থাপন করে থাকে, সেখানে মুছলমান বলে দাবিদার লোকেরা নিজেদের বিদ'আতকে বৈধ করার জন্য সেটাকে ধর্মীয় আঙ্গিকে শরী'য়ত প্রবর্তিত পন্থা বা বিষয়াদির সাথে বাহ্যিক সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে পেশ করবে, এটা তো খুবই স্বাভাবিক।

আর একারণেই বিদ'আতের সংজ্ঞায় "বাহ্যিকভাবে শরী'য়ত প্রবর্তিত বা শরী'য়ত সম্মত বিষয় সদৃশ মনে হয়" কথাটি সংযোজন করতে হয়েছে।

বিদ'আতের সংজ্ঞায় বর্ণিত "যে পথ অবলম্বনের দ্বারা আল্লাহ্‌র অধিক নৈকট্য লাভের ইচ্ছা পোষণ করা হয়" মূলত এই বাক্যটির মাধ্যমে বিদ'আতের পরিপূর্ণ অর্থ ও সঠিক চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। কেননা এটা (বেশি ছাওয়াব বা আল্লাহ্‌র অধিক নৈকট্য অর্জন) হলো বিদ'আত প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিদ'আত চর্চাকারী যখন দেখে যে, ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- আমি মানুষ ও জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার 'ইবাদতের জন্য। (ছূরা আয্ যারিয়াত- ৫৬)

তখন সে বেশি বেশি 'ইবাদত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়। কারণ সে মনে করে যে, মানুষ যেন বেশি বেশি আল্লাহ্‌র 'ইবাদত-বন্দেগী করে, এটাই হলো উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য। সে আয়াতের উল্লেখিত অর্থটাকেই কেবল দেখে। 'ইবাদতের জন্য শরী'য়তে যেসব নিয়ম-নীতি ও সীমারেখা দেয়া হয়েছে, বিদ'আত আবিষ্কার বা চর্চাকারী সেগুলোকে যথেষ্ট মনে করে না। বরং সে (বিদ'আত আবিষ্কারকারী) মনে করে যে, যেহেতু আয়াতে সাধারণভাবে শুধু 'ইবাদতের কথা বলা হয়েছে, সুতরাং স্থান-কাল ও অবস্থা বিবেচনায় 'ইবাদতের কিছু নিয়ম-নীতি নিজের পক্ষ হতে নির্ধারণ করা আবশ্যক। বিদ'আত আবিষ্কার বা চর্চাকারী কখনো নিজেকে প্রকাশ করার বা লৌকিকতার চরম আগ্রহ ও মানসিকতার দরুন কিংবা জাগতিক অন্য কোন লোভ-লালসার দরুন বিদ'আত আবিষ্কার বা চর্চা করে থাকে। আবার কখনো সে মনে করে যে, একই পদ্ধতিতে একই 'ইবাদত বারবার করতে করতে মানুষের মধ্যে ঐ 'ইবাদতের প্রতি এক ধরনের অনীহা ও বিরক্তি ভাব চলে আসে। এমতাবস্থায় মানুষের সামনে যদি নতুন কোন 'ইবাদত তোলে ধরা হয়, তাহলে তারা তাতে আগ্রহ ও উদ্দীপনা বোধ করবে। কেননা একথা স্বীকৃত যে, প্রত্যেক নতুনই (বিষয়/বস্তু) সুস্বাদু।

মোটকথা, নতুনের মধ্যে স্বাদ থাকে। প্রতিটি নতুন বিষয়-বস্তুর প্রতি মানুষের আগ্রহ-উদ্দীপনা প্রবল থাকে এবং একই কাজ দীর্ঘ দিন কিংবা বারবার করতে থাকলে এর প্রতি মানুষের বিরক্তি ভাব চলে আসে। এসব ভ্রষ্ট চিন্তা-ভাবনা থেকেই বিদ'আতের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে থাকে।

যাই হোক, বিদ'আতের উপরোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা জানা যায় যে, দ্বীনের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত যেসব পন্থা বা বিষয়াদী, যেগুলো দ্বীনী বিষয়াদির অনুরূপ বলে মনে হয়, কিন্তু এতদসত্ত্বেও এগুলো দ্বারা যদি 'ইবাদত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে, তাহলে তা বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে না এবং এরূপ কোন বিষয়কে বিদ'আত বলা যাবে না। বরং এ ধরনের বিষয় জাগতিক স্বাভাবিক কাজ-কর্ম ও রীতি-নীতি সংশ্লিষ্ট বিষয় বলে গণ্য হবে। এতে বিদ'আতের কোন অবকাশ নেই। যেমন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে সম্পদের ট্যাক্স বা ভ্যাট দেয়া ইত্যাদি বিষয় বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

'আল্লামা শাত্বিবী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন:- বিদ'আতের উপরোক্ত সংজ্ঞাটি তারাই দিয়ে থাকেন- যারা, যে সকল কাজের দ্বারা 'ইবাদত উদ্দেশ্য হয় না এরূপ নিছক্ জাগতিক বিষয়াদিকে বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করেন না।

পক্ষান্তরে যারা মনে করেন যে, 'ইবাদতে যেমন বিদ'আত হতে পারে তেমনি স্বাভাবিক জাগতিক রীতি-প্রথা বা কাজ-কর্মেও বিদ'আত হতে পারে, তারা বিদ'আতের সংজ্ঞায় বলে থাকেন যে, "বিদ'আত হলো- দ্বীনে ইছলামের মধ্যে শরী'য়ত প্রবর্তিত বা শরী'য়ত সম্মত পথের (দ্বীনী পন্থার) অনুরূপ নতুন আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত এমন কোন পথ বা বিষয়, যে পথ বা বিষয় অনুসরণের দ্বারা উদ্দেশ্য তা-ই হয়ে থাকে যা শরী'য়ত প্রবর্তিত পথ অনুসরণের দ্বারা উদ্দেশ্য হয়"।

অন্য কথায়, যে পথ সেই উদ্দেশ্যে অনুসরণ করা হয়ে থাকে, যে উদ্দেশ্যে শরী'য়ত প্রবর্তিত পথ অনুসরণ করা হয়।

বাহ্যিকভাবে প্রথমোক্ত সংজ্ঞা ও দ্বিতীয় সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য এইটুকুই যে, প্রথমোক্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- "যে পথ অনুসরণের দ্বারা আল্লাহ্‌র অধিক নৈকট্য লাভের ইচ্ছা পোষণ করা হয়"।

আর দ্বিতীয় সংজ্ঞাটিতে বলা হয়েছে- "যে পথ অনুসরণের দ্বারা উদ্দেশ্য তা-ই হয়ে থাকে, যা শরী'য়ত প্রবর্তিত পথ অনুসরণের দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে"। অর্থাৎ শরী'য়ত প্রবর্তিত পথ যে উদ্দেশ্যে অনুসরণ করা হয়, দ্বীনী নয় তবে দ্বীনের সদৃশ ইছলামে নব-আবিষ্কৃত বানোয়াট কোন পথ বা বিষয় যদি সেই একই উদ্দেশ্যে অনুসরণ করা হয়, তাহলে এই নব-আবিষ্কৃত পথ বা বিষয়টি 'ইবাদত সংশ্লিষ্ট হোক কিংবা স্বাভাবিক জাগতিক কোন বিষয় সংশ্লিষ্ট হোক, সর্বাবস্থায় বিদ'আত বলে গণ্য হবে। বিদ'আতের এই দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি যারা দিয়েছেন তাদের কথা হলো যে, মানুষের ইহ-পরকালের কল্যাণের জন্যই শরী'য়ত প্রবর্তন করা হয়েছে। তাই শরী'য়ত প্রবর্তিত পথ অনুসরণের উদ্দেশ্য হলো দুন্‌ইয়া ও আখিরাতে পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভ করা।

বিদ'আত চর্চাকারী বিদ'আতী কাজ অনুশীলন বা চর্চা দ্বারা এই উদ্দেশ্যই পোষণ করে থাকে। অর্থাৎ দুন্‌ইয়া এবং আখিরাতের পরিপূর্ণ কল্যাণ অর্জন করাই তার উদ্দেশ্য থাকে। তার বিদ'আত যদি সরাসরি 'ইবাদতের মধ্যে তথা 'ইবাদত সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় পরিপূর্ণ বা সর্বোচ্চ 'ইবাদতের মাধ্যমে পরকালে পরিপূর্ণ প্রতিদান বা মর্যাদা লাভ করা। আর যদি তার বিদ'আতটি জাগতিক স্বাভাবিক কোন কাজ-কর্ম বা রীতি-প্রথার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তাহলে এর দ্বারাও তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে - জাগতিক পরিপূর্ণ কল্যাণ

লাভ করা। যেমন- বাঁশ বা খঁড়-কুটোর পরিবর্তে দালান-বিল্ডিং নির্মাণ করা। এটি মানব জীবনে নব-আবিষ্কৃত একটি বিষয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাগতিক কল্যাণ অর্থাৎ আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তি উপভোগ করা।

সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, শরী'য়ত প্রবর্তনের মূলে যে উদ্দেশ্য রয়েছে, বিদ'আতকারী সেই একই উদ্দেশ্যে যেভাবে 'ইবাদতের মধ্যে নতুন পথ বা বিদ'আত আবিষ্কার করে থাকে, তেমনি জাগতিক স্বাভাবিক কাজ-কর্ম ও রীতি-প্রথার মধ্যেও নতুন পথ তথা বিদ'আত আবিষ্কার করে থাকে। দু'টি ক্ষেত্রেই ('ইবাদত এবং 'আদত বা স্বাভাবিক জাগতিক কাজ-কর্ম ও রীতি-প্রথা) বিদ'আত প্রবর্তনের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। তাই শুধু 'ইবাদতের ক্ষেত্রে নতুন প্রথা প্রবর্তনকে বিদ'আত বলা হবে, অথচ একই উদ্দেশ্যে অন্য ক্ষেত্রে নতুন প্রথা প্রবর্তনকে বিদ'আত বলা যাবে না, এটা কখনো হতে পারে না। বরং যে উদ্দেশ্যে ইছলামী শরী'য়ত প্রবর্তিত হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যে 'ইবাদতের মধ্যে নতুন প্রথা প্রবর্তন যেভাবে বিদ'আত বলে গণ্য হবে, তেমনি ঐ একই উদ্দেশ্যে 'আদতের মধ্যে নতুন প্রথা প্রবর্তন বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

বিদ'আতের উপরোক্ত সংজ্ঞা দু'টিকে বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে দু'টি সংজ্ঞাই এক ও অভিন্ন। কেননা পর্যালোচনা করলে উভয় সংজ্ঞা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, জাগতিক স্বাভাবিক কাজ-কর্ম বা রীতি-নীতিতে নতুন কিছু প্রবর্তন- এগুলো দ্বারা যদি আল্লাহ্‌র (ﷻ) নৈকট্য লাভ করা উদ্দেশ্য না হয় কিংবা এগুলো যদি 'ইবাদত হিসেবে পালিত না হয় বরং নিছক জাগতিক ও স্বাভাবিক কোন বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে শরী'য়তের পরিভাষায় তা বিদ'আত হিসেবে গণ্য হবে না। বরং নিছক স্বাভাবিক জাগতিক বিষয়ে নতুন আবিষ্কৃত কোন কর্ম বা পথ হিসেবে গণ্য হবে।

অপরদিকে একান্ত স্বাভাবিক জাগতিক কোন কাজ-কর্ম বা রীতি-নীতিতে নতুন কিছু প্রবর্তনের দ্বারা যদি আল্লাহ্‌র (ﷻ) নৈকট্য লাভ উদ্দেশ্য হয় কিংবা তা 'ইবাদত হিসেবে পালিত হয়, অথবা সেটাকে শরী'য়ত প্রবর্তিত বিষয় হিসেবে দেখা হয়, তাহলে উভয় সংজ্ঞা মতেই সেটি বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

তাইতো দেখা যায় যে, পাপকাজ সমূহের মধ্যে এমন অনেক পাপ রয়েছে যেগুলো বিদ'আত। পক্ষান্তরে এমন অনেক পাপ কাজ রয়েছে যেগুলো কাবীরাহ্ গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও বিদ'আত নয়।

{উপরোক্ত বিষয়ে আমার (অনুবাদকের) কথা হলো- মূলত: বিদ'আতের উপরোক্ত সংজ্ঞা দু'টির মধ্যে পরস্পর আদৌ কোন বিরোধ নেই। কেননা প্রথমোক্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- দ্বীনের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত পথ অনুসরণ দ্বারা আল্লাহ্‌র (ﷻ) অধিক 'ইবাদত করা বা তাঁর অধিক নৈকট্য অর্জন করা উদ্দেশ্য হবে।

আর দ্বিতীয় সংজ্ঞাটিতে বলা হয়েছে- দ্বীনের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত যে পথ বা বিষয় অনুসরণ দ্বারা তা-ই উদ্দেশ্য হবে, যা কিছু শরী'য়ত প্রবর্তিত পথ বা বিষয় অনুসরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

এ দু'টি কথা প্রথমতঃ শাব্দিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন হলেও পরিভাষাগত অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে এক ও অভিন্ন। কেননা এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই যে, বেশি করে আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করা কিংবা তাঁর অধিক নৈকট্য অর্জন করা, মূলত: এটিই হলো দুন্‌ইয়া ও আখিরাতের সবচেয়ে বড় কল্যাণ ও সফলতা। অপরদিকে শরী'য়ত প্রবর্তিত পথ অনুসরণের উদ্দেশ্যও হচ্ছে তা-ই।

দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়েও সকলেই একমত যে, শরী'য়ত প্রবর্তনের উদ্দেশ্য যেমন মানবজাতির শুধু দুন্‌ইয়া বা শুধু আখিরাতের কিংবা পৃথক পৃথকভাবে দুন্‌ইয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধন নয়, তেমনি শরী'য়ত প্রবর্তিত পথ অনুসরণের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দুন্‌ইয়া কিংবা শুধুমাত্র আখিরাতের কিংবা পৃথক পৃথকভাবে দুন্‌ইয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন করা নয়। বরং শরী'য়ত প্রবর্তিত পথ অনুসরণের দ্বারা একই সাথে দুন্‌ইয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করাই হলো উদ্দেশ্য। শরী'য়ত প্রবর্তনের উদ্দেশ্যও হলো- বান্দাহ্ যেন তদ্বারা (শরী'য়তে ইছলামিয়্যাহ দ্বারা) একই সময়ে ইহ-পরকালের কল্যাণ লাভ করতে পারে।

অতএব বিদ'আতের দ্বিতীয় সংজ্ঞায় যা বলা হয়েছে, তার অর্থ হলো:- একই সাথে দুন্‌ইয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের নিমিত্ত কেউ যদি দ্বীনের মধ্যে দ্বীনের সদৃশ নতুন কোন পথ আবিষ্কার করে (সে পথটি 'ইবাদত সংক্রান্ত হোক বা জাগতিক কোন কাজ-কর্ম বা স্বাভাবিক রীতি-নীতি সংক্রান্ত হোক) সর্বাবস্থায় সেটি বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

এই অর্থ হতে এ কথা পরিষ্কার যে, জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে নব-আবিষ্কৃত কোন পথ অনুসরণের দ্বারা যদি আখিরাতের কল্যাণ উদ্দেশ্য না হয় বরং শুধুমাত্র দুন্‌ইয়াওয়ী বা জাগতিক কল্যাণ অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে সেটি বিদ'আত বলে গণ্য হবে না। কেননা মানুষের শুধুমাত্র জাগতিক কল্যাণ সাধনই শরী'য়তের উদ্দেশ্য নয়, বরং একই সাথে উভয় জগতের কল্যাণ সাধনই হলো শরী'য়ত প্রবর্তনের উদ্দেশ্য। প্রথমোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা মূলত একথাটিই বুঝানো হয়েছে। একমাত্র আল্লাহ-ই (ﷻ) সর্ব-বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত।}

[অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত]

সূত্র: **আল ই'তিসাম- লিল ইমাম আবী ইছহাক্ব আশ্‌শাত্বিবী**

শরী'য়তের দৃষ্টিতে 'ঈদে মীলাদুন্নাবী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নব-আবিষ্কৃত একটি বিষয়। এর পক্ষে আল্লাহ ﷻ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। রাছূলুল্লাহ্‌ও (ﷺ) তার কথা, কাজ কিংবা কোনরূপ অনুমোদন দ্বারা এ কাজটি প্রবর্তন বা অনুমোদন করেননি। অথচ তিনিই হলেন আমাদের অনুসরণীয়; ইমাম। ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- রাছূল তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তোমরা তা অবলম্বন করো, আর যা কিছু থেকে তিনি তোমাদেরকে বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো। (ছূরা আল হাশ্‌র- ৭)

আল্লাহ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাছূলুল্লাহ্‌র (ﷺ) মধ্যে রয়েছে উত্তম-অনুপম আদর্শ; যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে বেশি বেশি স্মরণ করে। (ছূরা আল আহ্‌যাব- ২১)

রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- যে আমাদের এই দ্বীনের (শরী'য়তের) মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, তাহলে তা হবে প্রত্যাখ্যাত। (সাহীহ্ বুখারী- ২৬৯৭। সাহীহ্ মুছলিম- ১৭১৮)

২) খুলাফায়ে রাশিদূন এবং রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম ﷺ কেউ-ই মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে 'ঈদ উদযাপন কিংবা কোন অনুষ্ঠান বা মাহ্‌ফিলের আয়োজন করেননি। তারা নিজেরা যেমন করেননি তেমনি অন্যদেরকেও এরূপ কিছু করার প্রতি আহ্বান জানাননি। অথচ রাছূলের (ﷺ) পরে তারাই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাত। খুলাফায়ে রাশিদূন সম্পর্কে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- তোমাদের উপর আবশ্যকীয় হলো আমার ছুন্নাত এবং আমার পরে খুলাফায়ে রাশিদূনের ছুন্নাত অবলম্বন করা, তোমরা একে মাড়ি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরো এবং তোমরা নব-আবিষ্কৃত বিষয়াদী হতে সাবধান থেকো। কেননা প্রতিটি নব-আবিষ্কৃত বিষয়ই হলো বিদ'আত আর প্রতিটি বিদ'আতই হলো পথভ্রষ্টতা। (আবূ দাউদ- ৪৭০৭। তিরমিযী- ২৬৭৬)

৩) মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে 'ঈদ উদযাপন বা অনুষ্ঠান পালন করা- এটি হলো বিপথগামী; পথভ্রষ্টদের প্রবর্তিত একটি প্রথা। যেমন আমরা প্রবন্ধের শুরুতেই জেনেছি যে, আনুষ্ঠানিকভাবে মীলাদুন্নাবী পালনের প্রথা সর্বপ্রথম চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে ফাত্বিমী 'উবায়দী শী'আ শাসকগণ প্রবর্তন করেছিল।

সুতরাং বিবেকসম্পন্ন কোন মুছলমান কি কখনো রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর ছুন্নাতের বিরোধিতা করতে পারে এবং শী'আ-রাফিযীদের প্রবর্তিত পথ ও প্রথা অনুসরণ করতে পারে? অবশ্যই না।

৪) আল্লাহ ﷻ দ্বীনে ইছলামকে পরিপূর্ণ ও সুসম্পন্ন করে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নি'মাত সুসম্পন্ন করে দিলাম এবং ইছলামকে দ্বীন হিসেবে তোমাদের জন্য মনোনীত করে দিলাম। (ছূরা আল মা-য়িদাহ্- ৩)

রাছূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্‌র এই দ্বীনকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মানবজাতির নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। মানুষকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখে- এমন প্রত্যেকটি বিষয় তিনি তাঁর উম্মাতকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানিয়ে গেছেন। মোটকথা, উম্মাতের জন্য কল্যাণকর এমন কোন বিষয় নেই যে সম্পর্কে তিনি তাঁর উম্মাতকে অবহিত করেননি এবং উম্মাতের জন্য অকল্যাণকর বা অনিষ্টকর এমন কোন বিষয় নেই, যে সম্পর্কে তিনি উম্মাতকে সতর্ক করেননি। কেননা আমাদের নাবী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নাবী। মানবজাতির কাছে আল্লাহ্‌র বার্তা পৌঁছে দেয়ার এবং আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দেরকে নাসীহাত প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সকল নাবী-রাছূলের ('আলাইহিমুছ্ ছালাম) মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। যদি মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান বা 'ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করা এমন কোন দ্বীনী কাজ বা 'ইবাদত হতো যেটাকে আল্লাহ ﷻ পছন্দ করেন এবং যদ্বারা আল্লাহ্‌র (ﷻ) সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, তাহলে অবশ্যই রাছূলুল্লাহ্ ﷺ সেটা তাঁর উম্মাতকে জানিয়ে দিতেন অথবা তিনি তাঁর জীবদ্দশায় নিজে এ কাজটি করতেন। কিন্তু তিনি নিজে এরূপ করেছেন কিংবা উম্মাতকে তা করতে বলেছেন মর্মে আদৌ কোন প্রমাণ নেই। অথচ রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- আল্লাহ্ ﷻ যতো নাবী প্রেরণ করেছেন তাদের প্রত্যেকের উপরই ওয়াজিব ছিল- যতো কিছু তাদের নিজ নিজ উম্মাতের জন্য মঙ্গলজনক বা কল্যাণকর হিসেবে জানবেন সেসব বিষয়ে তাদেরকে পথ-নির্দেশ দেয়া (অবহিত করা), আর যতো কিছু তাদের জন্য অনিষ্ঠ-অকল্যাণকর বলে জানবেন সেসব বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক ও সাবধান করা। (সাহীহ্ মুছলিম- ২/১৪৭৩, হাদীছ নং- ১৮৪৪)

৫) দ্বীনে ইছলামে এ ধরনের মীলাদ বা জন্মদিবস পালনের বিদ'আতী প্রথা প্রবর্তনের দ্বারা প্রথমতঃ এ কথাই বুঝা যায় যে, আল্লাহ ﷻ এই উম্মাতের জন্য দ্বীনে ইছলামকে পরিপূর্ণ করে দেননি বরং তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তাই তা সম্পূর্ণ করার জন্য নতুন কিছু করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত: দ্বীনের মধ্যে কোন বিদ'আত পন্থা প্রবর্তনের দ্বারা বুঝা যায় যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ, এই উম্মাতের জন্য যা কিছু প্রয়োজন ও প্রাপ্য ছিল তা তিনি (রাছূল (ﷺ) পুরোপুরি ও যথাযথভাবে তাদের নিকট পৌঁছে দেননি। তাই পরবর্তীতে এইসব বিদ'আতীগণ শরী'য়তের মধ্যে নতুন কিছু বিষয় (বিদ'আত) প্রবর্তন ও সংযোজন করে দিয়ে উম্মাতের সেই দ্বীনী প্রয়োজনটুকু পূরণ করে দিয়েছে। তাদের ধারণা হলো যে, এর দ্বারা তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারবে।

অথচ প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোন কাজ করার অনুমতি আল্লাহ ﷻ তাদেরকে দেননি। শুধু তাই নয় বরং এর দ্বারা প্রকারান্তরে তারা একদিকে যেমন আল্লাহ্‌র উপর অভিযোগ আরোপ করছে অপরদিকে একথাই বলছে যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ, তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করেননি বরং তিনি আল্লাহ্ ﷻ প্রদত্ত রিছালাতের আমানত খিয়ানাত করেছেন। ছুবহানাল্লাহ্! এরূপ ধারণা আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাছূলের (ﷺ) উপর জঘন্য মিথ্যা অপবাদ আরোপ বৈ কিছু নয়। আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাছূল ﷺ এরূপ অভিযোগ ও অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পুতঃ পবিত্র। ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং বান্দাহ্‌গণের উপর তাঁর এই নি'মাত সুসম্পন্ন করে দিয়েছেন।

৬) বিদ'আত বর্জন করার ও বিদ'আত থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকার বিষয়ে এবং সর্বক্ষেত্রে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর অনুসরণ করার, কথায়, কাজে বা 'আমলে তাঁর বিরোধিতা না করা সম্পর্কে ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্-তে যেসব দলীল রয়েছে, সেসব দলীলের ভিত্তিতে হাক্ব্যানী 'উলামায়ে কিরাম যে কারো মীলাদ তথা জন্মদিন বা জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কোনরূপ অনুষ্ঠান আয়োজন বা 'ঈদ উদযাপনকে অত্যন্ত

৭) মীলাদুন্নাবী পালনের দ্বারা রাছূলের (ﷺ) প্রতি আদৌ কোন ভালোবাসা প্রদর্শিত হয় না। রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর যথাযথ অনুসরণ, তাঁর ছুন্নাহ্ অনুযায়ী 'আমল এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমেই প্রকৃত অর্থে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা প্রদর্শিত হয়ে থাকে।
(কেননা সত্যিকার অর্থে যে যাকে ভালোবাসে, সে তার আনুগত্য করে থাকে)

তাইতো আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- (হে নাবী) আপনি বলুন! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ করো- আল্লাহ তোমাদিগকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (ছুরা আ-লে 'ইমরান- ৩১)

৮) 'ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন কিংবা মীলাদুন্নাবী পালনের মধ্যে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের 'ঈদ বা বড়দিন পালনের সাথে মিল বা সামঞ্জস্য রয়েছে। যদ্দরুন এর দ্বারা (মীলাদুন্নাবী পালন বা উদযাপন দ্বারা) 'আমল বা কাজ-কর্মে তাদের (ইয়াহূদী-নাসারাদের) সাদৃশ্য ধারণ করা করা হয়। অথচ আমাদেরকে (মুছলমানদেরকে) তাদের সাদৃশ্য ধারণ করতে এবং তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। (ইয়াহূদী-নাসারাদের অনুসরণ ও সাদৃশ্য ধারণ থেকে বিরত থাকার আবশ্যকতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ প্রণীত "ইক্বতিযাউস্ সিরাত্বিল মুছতাক্বীম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ, বিশেষ করে এর ২/৬১৪-৬১৫ নং পৃষ্ঠা দু'টি পড়ুন। আরো দেখুন! ইমাম ইবনুল ক্বায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ্ সংকলিত গ্রন্থ "যাদুল মা'আদ"- ১/৯৫)

৯) ইছলামী শরী'য়তের অন্যতম একটি মূলনীতি হলো- মানুষের মাঝে বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ফায়সালার জন্য আল্লাহ্‌র (ﷻ) কিতাব; ক্বোরআনে কারীম ও রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর ছুন্নাহ্‌র কাছে ফিরে যাওয়া। ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করো, আনুগত্য করো রাছূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর তোমরা যদি কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে যাও তাহলে বিষয়টি আল্লাহ ও রাছূলের দিকে প্রত্যার্পণ করো- যদি তোমরা আল্লাহ ও ক্বিয়ামাত দিবসে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর এবং প্রত্যার্পণের জন্য উত্তম। (ছুরা আন্‌নিছা- ৫৯)

আল্লাহ্ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফায়সালা আল্লাহ্‌র কাছে। (ছুরা আশ্‌শুরা- ১০)

ক্বোরআনে কারীমের এসব নির্দেশ অনুযায়ী যদি কেউ মীলাদ পালনের বিষয়টি নিয়ে ফায়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাছূলের দিকে প্রত্যার্পণ করে অর্থাৎ ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌র কাছে ফিরে যায়, তাহলে অবশ্যই সে ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌র কোথাও মীলাদ কিংবা মীলাদুন্নাবী পালনের বিষয়টি খুঁজে পাবে না।

মীলাদ পালনের বিষয়টি নিয়ে ফায়সালার জন্য ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌র নিকট গমনকারী ব্যক্তি আরো দেখতে পাবে যে, ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি দ্বীনে ইছলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন (তাতে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা নেই) এবং তিনি ঈমানদারদের জন্য তাঁর এই মহান নি'মাত সুসম্পন্ন করে দিয়েছেন। অথচ ক্বোরআনে কারীমের কোথাও মীলাদ বা মীলাদুন্নাবী পালনের কোনরূপ নির্দেশ দেয়া হয়নি।

মীলাদ পালনের বিষয়টি নিয়ে ফায়সালার জন্য ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌র নিকট প্রত্যার্পণকারী ব্যক্তি আরো দেখতে পাবে যে, আল্লাহ ﷻ তাঁর নাবীর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি (আল্লাহ ﷻ) ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- রাছূল তোমাদেরকে যা দেন, তোমরা তা গ্রহণ করো এবং যা কিছু থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো। (ছুরা আল হাশ্‌র- ৭)

অথচ রাছূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজের কিংবা অন্য কারো জন্মদিন বা জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'ঈদ অথবা কোনরকম অনুষ্ঠান পালনের নির্দেশ প্রদান করেননি। মীলাদ পালনের প্রথা তিনি প্রবর্তন করে যাননি। তাঁর সাহাবায়ে কিরামও এরকম কিছু করেননি। শুধু তাই নয়, বরং তিনি নিজে যা করেননি বা করার অনুমোদন দেননি, এমনিভাবে তাঁর খুলাফায়ে রাশিদূন ﷺ যা করেননি এমন কোন প্রথা প্রবর্তন করতে কিংবা এমন কোন কাজ করতে (রাছূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজের ও তাঁর খুলাফায়ে রাশিদাহ্‌র ছুন্নাহ্ বহির্ভূত কোন কাজ করতে) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং এরূপ কিছু করাকে তিনি বিদ'আত বলে অভিহিত করেছেন।

সুতরাং এতে করে স্পষ্টভাবে জানা ও বুঝা গেল যে, মীলাদুন্নাবী মাহ্‌ফিল বা মীলাদ অনুষ্ঠান পালন করা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত তথা শরী'য়ত সম্মত কোন কাজ নয় বরং এটি হলো দ্বীনের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত একটি বিদ'আত।

১০) তবে কেউ যদি চায় বা পছন্দ করে তাহলে সে সোমবার দিনে রোযা রাখতে পারে। কেননা রাছূলুল্লাহ্‌কে (ﷺ) একদা সোমবার দিনে রোযা পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:- অর্থ- এটা (সোমবার) হলো সেই দিন যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি এবং এই দিনেই আমাকে রাছূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে অথবা এই দিনে আমার প্রতি অহী (ক্বোরআন) নাযিল হয়েছে। (সাহীহ্ মুছলিম- ২/৮১৯, হাদীছ নং- ১৬২)

সুতরাং শরী'য়তের বিধান হলো- ইচ্ছে হলে সোমবার দিন নফল রোযা পালনের মাধ্যমে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর অনুসরণ ও অনুকরণ করা। তবে কোন অবস্থাতেই রাছূলুল্লাহ ﷺ এর জন্মদিন, জন্মবার্ষিকী বা জন্ম স্মরণে মীলাদ মাহ্‌ফিল বা 'ঈদে মীলাদুন্নাবী ইত্যাদি পালন না করা।

১১) মীলাদ মাহ্‌ফিল, মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান পালন কিংবা 'ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন উপলক্ষে শরী'য়ত বিরোধী অনেক কর্মকান্ড সংঘটিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে দু-তিনটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:-

(ক) মীলাদ মাহ্‌ফিলগুলোতে যেসব ক্বাসীদাহ্-গজল, না'তে রাছূল ইত্যাদি পাঠ করা হয়, সেসবের বেশিরভাগের মধ্যে শির্‌কী শব্দ, বাক্য ও কথা-বার্তা ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া ওগুলোতে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রশংসায় মারাত্মক অতিরঞ্জন ও সীমালংঘন করা হয়ে থাকে। অথচ এসব বিষয় থেকে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ কঠোরভাবে সতর্ক ও সাবধান করেছেন। তিনি বলেছেন:- অর্থ- আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করো না, যেভাবে নাসারাগণ মারইয়াম পুত্রের ('ঈছা ইবনু মারইয়াম-এর) প্রশংসায় অতিরঞ্জন করেছিল। আমি তো কেবল তাঁর (আল্লাহ্‌র) বান্দাহ্ হই, অতএব তোমরা (আমাকে) বলো- "আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ ও রাছূল"। (সাহীহ্ বুখারী- ৩৪৪৫)

(খ) অধিকাংশ মীলাদ মাহ্‌ফিলে শীর্‌ক ছাড়াও বিভিন্ন রকমের হারাম কর্ম-কান্ড সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন- তাতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা, গান-বাজনা, নেশাজাতীয় দ্রব্য (মদ, গাজা ইত্যাদি) পান করা হয়। কখনো কখনো এসব মাহ্‌ফিলে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ কিংবা অন্য কোন অলী-আউলিয়া এর নিকট আশ্রয় বা সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে শিরকে আকবার করা হয়। সেখানে ক্বোরআনে কারীম তিলাওয়াতের মাজলিছে বিড়ি-সিগারেট পান করা হয়, যেটি মূলতঃ ক্বোরআন অবমাননার শামিল। অনর্থক কাজে বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা অপব্যয় ও অপচয় করা হয়। মীলাদুন্নাবী উদযাপনের দিনগুলোতে বিভিন্ন মাছজিদে উচ্চস্বরে-সমস্বরে তালে তাল মিলিয়ে, হাতে জোরে জোরে তালি বাজিয়ে, কোথাও কোথাও দেখা যায় ঢোল-তবলা বজিয়ে নানারকম বিকৃত (বিদ'আতী) বানোয়াট যিক্‌র-আযকার করা হয়।

অথচ উপরোক্ত কার্যকলাপ যে আদৌ শরী'য়ত সম্মত নয় বরং তা নিষিদ্ধ-হারাম, সে বিষয়ে সকল হাক্ব্যানী 'উলামায়ে কিরাম একমত; এসম্পর্কে তাদের কারো কোন দ্বিমত নেই। (দেখুন! আল ইবদা' ফী মাযা-র্‌রিল ইবতিদা'- লিশ্‌শাইখ 'আলী মাহ্‌ফূয)

(গ) অনেক জায়গায় মীলাদুন্নাবী মাহ্‌ফিলে আরেকটি কাজ করা হয়ে থাকে, আর তা হলো- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্ম-বৃত্তান্ত আলোচনার সময় তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়া। যারা এরকম ক্বিয়াম করে থাকেন তাদের ধারণা বা বিশ্বাস হলো- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের এই মাহ্‌ফিল বা মাজলিছে এসে হাযির (উপস্থিত) হন। আর তাই তারা তাকে স্বাগত ও শ্রদ্ধা জানাতে দাঁড়িয়ে যান।

কেননা
ক্বোরআনে কারীম ও ছুন্নাহ্ দ্বারা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে একথা প্রমাণিত যে, মৃত্যুর পর ক্বিয়ামাতের আগ পর্যন্ত রাছূলুল্লাহ্ ﷺ স্বীয় ক্ববর থেকে বের হবেন না। কোন লোকের সাথে তিনি যোগাযোগ করবেন না এবং মানুষের কোন মাহ্‌ফিল, মাজলিছ বা সম্মেলনে উপস্থিত হবেন না। তিনি (রাছূলুল্লাহ্ ﷺ) ক্বিয়ামাত পর্যন্ত স্বীয় ক্বরেই অবস্থান করবেন। আর তাঁর মুবারাক রূহ্ তাঁর মহান প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট আ'লা 'ইল্লিয়্যিন-নে (সর্বোচ্চ সুমহান স্থানে) দারুল কারামাহ্ বা সম্মানিত গৃহে রয়েছে। (দেখুন! আত্ তাহ্‌যীর মিনাল বিদ'য়ি- লিল 'আল্লামা 'আব্দুল 'আযীয ইবনু বায)

ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- এরপর অবশ্যই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর ক্বিয়ামাতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে। (ছুরা আল মূমিনূন- ১৫-১৬)

ক্বিয়ামাতের দিনই নিজ নিজ ক্বর থেকে বের হবেন, এর আগে নয়। আশ্‌শাইখ আল 'আল্লামা 'আব্দুল 'আযীয ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেছেন যে, উপরোক্ত বিষয়ে (সর্ব কালের সর্ব যুগের) সকল 'উলামায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে; এ সম্পর্কে তাদের কারো কোন দ্বিমত নেই। (দেখুন! আত্ তাহ্যীর মিনাল বিদ'য়ি- লিশ্‌শাইখ আল 'আল্লামা 'আব্দুল 'আযীয ইবনু বায। পৃষ্ঠা নং- ৭-১৪। আল ইবদা' ফী মাযা-র্‌রিল ইবতিদা'- লিশ্‌শাইখ 'আলী মাহ্‌ফূয। পৃষ্ঠা নং- ২৫০-২৫৮। আত্ তাবার্‌রুক ওয়া আনওয়া'উহু – লিশ্‌শাইখ ড. নাসির ইবনু 'আব্দির রাহ্‌মান আল জুদাই'। পৃষ্ঠা নং- ৩৫৮-৩৭৩। তাম্বীহু উলিল আবসার ইলা কামালিদ্ দ্বীন ওয়ামা ফিল বিদ'য়ি মিন আখত্বার- লিশ্‌শাইখ ড. সালিহ্ আছ্ ছুহাইমী। পৃষ্ঠা নং- ২২৮-২৫০।)

উপরোক্ত কারণ ও দলীল-প্রমাণ সমূহের দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্মদিন বা জন্মবার্ষিকী বিশেষভাবে পালন করা, এ উপলক্ষে অনুষ্ঠান বা মাহ্‌ফিল করা, 'ঈদ উদযাপন করা কিংবা তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়া অথবা দাঁড়িয়ে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতি ছালাম ও সালাত পাঠ করা ইত্যাদি দ্বীনে ইছলামে নব-আবিষ্কৃত বিদ'আত ও শরী'য়ত বহির্ভূত কাজ- যা অবশ্যই বর্জনীয়।

সূত্রঃ নূরুছ্ ছুন্নাহ্ ওয়া যুলুমাতুল বিদ'আহ্ ।

প্রস্রাব-পায়খানার সঠিক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অর্থাৎ- তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আনো, না আমি বর্ষণ করি? (ছূরা আল ওয়াক্বি'আহ্- ৬৮-৬৯)

আল্লাহ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- বলুন! তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির স্রোতধারা? (ছূরা আল মুল্‌ক্- ৩০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ূ পরিচালনা করি অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুতঃ তোমাদের কাছে এর ভান্ডার নেই। (ছূরা আল হিজ্‌র- ২২)

এসব আয়াতে আল্লাহ ﷻ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আকাশ থেকে বর্ষিত আর যমীন থেকে উত্থিত পানি- আমাদেরকে দেয়া তাঁরই নি'মাহ্।

আমরা যেসব খাদ্য খাই, সেগুলোও আমাদেরকে দেয়া আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, দান ও নি'মাহ্। ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী? (ছূরা আল ওয়াক্বি'আহ্- ৬৩-৬৪)

সুতরাং আমাদের খাদ্যও হলো আল্লাহ প্রদত্ত মহান নি'মাহ্। তিনিই এগুলো (খাদ্য-শস্য) উৎপন্ন করেছেন, বৃদ্ধি করেছেন এবং পূর্ণতা দান করেছেন। অতঃপর এগুলো কর্তন করার, গোলাজাত করার, প্রেষণ করার এবং পাকানো বা রান্না করার উপকরণ ও সরঞ্জাম আমাদের জন্য সহজলভ্য করে দিয়েছেন। এছাড়াও আরো যে কতো নি'মাহ্ আল্লাহ ﷻ দান করেছেন, তার কোন ইয়ত্তা নেই।

কোন কোন 'উলামায়ে কিরাম বলেছেন- কোন একটি খাবার প্রস্তুত হয়ে আমাদের সামনে আসা পর্যন্ত মানুষের জ্ঞানমতে এবং মানুষ উপলব্ধি করতে পারে- আল্লাহ্‌র (ﷻ) এমন তিনশত ষাটটি নি'মাহ্ তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ৩৬০টি নি'মাহ্ ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হয়েই একটি খাদ্য খাওয়ার উপযোগী হয়ে মানুষের সামনে আসে। (গিযাউল আলবাব লি শারহি মানযূমাতিল আদাব- ২/১১৯-১২০) **এই ৩৬০টি নি'মাত হলো এমন যেগুলো মানুষ উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং মানুষের বোধগম্যতা বা উপলব্ধির বাইরে এই পর্যন্ত শুধু ৩৬০ নয় বরং আরো কতো যে শত-সহস্র নি'মাহ্ অতিক্রান্ত ও বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, তা কেবল রাব্বুল 'আলামীনই ভালো জানেন।**

এরপর এই খাদ্য খাওয়ার সময়ও আল্লাহ্‌র অসংখ্য নি'মাহ্ উপভোগ করা হয়। খাওয়ার সময় জিহ্বায় যে স্বাদ অনুভূত হয়, প্রচন্ড ক্ষুধায় খাওয়ার সময় খাদ্যে যে প্রচন্ড স্বাদ পাওয়া যায়, এটা কোথা থেকে আসে? কিভাবে হয়? অবশ্যই তা আল্লাহ্‌র (ﷻ) এক একটি মহান নি'মাহ্। খাবার যখন পেটের মধ্যে; ভুঁড়িতে যায়, তখন কোন রকম কষ্ট অনুভব হয় না। এটাও আল্লাহ্‌র (ﷻ) এক বিশেষ নি'মাহ্। নতুবা আপনি দেখবেন, এখনই যদি আপনার হাতে একটি মাছি বসে, তাহলে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পতঙ্গের উপস্থিতি আপনি সাথে সাথে টের পাবেন এবং তাঁর পায়ের ছোঁয়ায় আপনি শিঁউরে উঠবেন। আপনার শরীর শিহরিত হয়ে উঠবে। অথচ বিভিন্ন ধরনের কতো ভারী ভারী খাদ্য অতি ক্ষুদ্র ও সরু নালী দিয়ে আপনার ভুঁড়িতে (পেটে) অনায়াসে পৌঁছে যাচ্ছে, আপনি টেরও পাচ্ছেন না। (ছুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী ছুবহানাল্লাহিল 'আযীম।)

এর কারণ হলো- আল্লাহ ﷻ মানুষের পেটের তথা বৃহদান্ত্র ও ক্ষুদ্রান্তের ভেতরের অংশটাকে বাহ্যিক অনুভূতিহীন করে বানিয়েছেন, তাই যে কোন কিছু পেটের মধ্যে চলে যায় কিন্তু পেট তা টেরও পায় না। আল্লাহ ﷻ পেটের মধ্যে এমন কিছু লালা-গ্রন্থি সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যেগুলো খাদ্যকে নরম ও হালকা করে দেয়, যাতে সহজেই এগুলো নিচে নেমে আসতে পারে। তিনি (আল্লাহ ﷻ) গলার ভিতরে এমন কতকগুলো নল বা নালী সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যেগুলো দিয়ে পানি পেটের মধ্যে প্রবাহিত হয়। আবার পেটের বৃহদান্ত্র ও ক্ষুদ্রান্তের মধ্য দিয়ে এমন কতকগুলো শিরা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যেগুলো সমস্ত শরীরে রক্ত ছড়িয়ে দেয়। তবে এই রক্ত বিক্ষিপ্ত বা এলোমেলোভাবে মানব শরীরে চলাচল করে না বরং অত্যন্ত সুনিপূণ ও সুশৃঙ্খলভাবে চলাচল করে। সমস্ত শরীরের রক্ত ধমনীর মধ্য দিয়ে বাম অলিন্দ (Left Atrium) দিয়ে হৃদযন্ত্রে গিয়ে পৌঁছায়। অতঃপর এই ছোট্র যন্ত্রটি (হৃদপিন্ড) মূহুর্তের মধ্যে সেই রক্তকে পরিশোধন করে তার (হৃদযন্ত্রের) অন্য পাশ দিয়ে বাম নিলয় (Left Ventricle) শিরার মাধ্যমে সারা দেহে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত ছড়িয়ে দেয়। অতঃপর এই রক্ত আবার সারা শরীরে ঘুরপাক খেয়ে পুনরায় হৃদপিন্ডে ফিরে যায়। হৃদপিন্ড এটাকে পরিষ্কার-পরিশোধন করে অন্য পাশ দিয়ে অতিদ্রুত আবার সারা শরীরে ছড়িয়ে দেয়, আর এভাবেই চলতে থাকে মানুষের জীবন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো- আমাদের শরীরে এতসব কর্মকান্ড অহরহ ঘটে চলছে, অথচ আমরা তা টেরও পাচ্ছিনা। প্রতিটি মূহুর্তে হৃদযন্ত্রে স্পন্দন হচ্ছে (লাব-ডাব, লাব-ডাব)। প্রতিটি (লাব) স্পন্দনের সাথে হৃদপিন্ড কিছু রক্ত শোষণ করে, আর পরবর্তী (ডাব) স্পন্দনের সাথে সাথে কিছু রক্ত সাপ্লাই বা সরবরাহ করে দেয়। এতদসত্ত্বেও এই রক্ত সমস্ত শরীরে মাত্র কয়েক মূহুর্তের মধ্যেই অত্যন্ত সুনিপূণ ও সুশৃঙ্খলভাবে পৌঁছে যায়। আর এ সবই হয় আল্লাহ্‌র (ﷻ) মহান হিকমাহ্ অনুসারে, তাঁরই ক্বোদরাহ্ ও নির্দেশে।

দেহে রক্ত চলাচলের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র (ﷻ) আরো বড় ক্বোদরাহ্ ও হিকমাহ্ হলো যে, শরীরের প্রতিটি অঙ্গের শীরা বা ধমনীগুলোর গতিপথ এক নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন। ডান হাতের শীরার গতিপথ বাম হাতের শীরার গতিপথ থেকে ভিন্ন। ডান পায়ের আর বাম পায়ের শীরার গতিপথ এক নয়। আর এসব প্রতিটি বিষয়ই আল্লাহ্‌র (ﷻ) অশেষ ক্বোদরাহ্ ও হিকমাহ্‌র সুস্পষ্ট প্রমাণ। যদি প্রতিটি অঙ্গের শীরার গতিপথ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার মধ্যে কোন হিকমাহ্ না থাকতো, তাহলে আল্লাহ ﷻ এগুলোকে এভাবে সৃষ্টি করতেন না।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল একথাই বলা যে, একটি খাবার প্রস্তুত হয়ে আমাদের কাছে আসা এবং সেটি পেটে পৌঁছা পর্যন্ত তাতে আমাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুগত এবং শারীরিক অগনিত-অসংখ্য নি'মাহ্, দয়া, অনুগ্রহ ও অনুকম্পা রয়েছে।

আর শুধু বস্তুগত বা শারীরিক নি'মাহ্ই নয় বরং খাদ্য খাওয়ার আগে ও পরে তাতে আল্লাহ্‌র (ﷻ) অসংখ্য দ্বীনী নি'মাহ্ও রয়েছে। যেমন দেখুন, খাদ্য খাওয়ার সময় আমরা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে অর্থাৎ "বিছমিল্লাহ্" বলে খাই এবং খাওয়া শেষে "আলহামদুল্লিাহ্" বলি। বান্দাহ যখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে হালাল কোন কিছু খায় বা পান করে এবং পানাহার শেষে কিংবা আল্লাহ্‌র (ﷻ) দেয়া নি'মাহ্ উপভোগ করে তজ্জন্য যদি আল্লাহ্‌র (ﷻ) প্রশংসা ও শুক্‌র আদা করে, তাহলে আল্লাহ ﷻ এ কাজটাকে খুবই পছন্দ করেন এবং এতে তিনি বান্দাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হন। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই তো হলো প্রতিটি মানুষের (মুছলমানের) মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অতএব শারীরিক ও বস্তুগত নি'মাহ্ থেকে আল্লাহ্‌র (ﷻ) সন্তুষ্টি অর্জনই হলো সবচেয়ে বড় নি'মাহ্। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন থেকে বড় নি'মাহ্ আর কী হতে পারে?

এবার দেখুন! এই মহান নি'মাহ্ অর্জনের পথ আল্লাহ ﷻ আমাদের জন্য কিভাবে সহজ ও সুগম করে দিয়েছেন।

খাওয়ার শুরুতে "বিছমিল্লাহ্" এবং খাওয়া শেষে "আলহামদুলিল্লাহ্" বলা, এ কাজ দু'টিকে আল্লাহ ﷻ আমাদের জন্য ছুন্নাত সাব্যস্ত করে দিয়েছেন, যাতে সহজেই আমরা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। যদি তিনি আমাদেরকে এ কাজের অনুমতি না দিতেন, এটা যদি শরী'য়ত সম্মত কাজ না হতো, আর এতদসত্ত্বেও আমরা যদি তা করতাম, তাহলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন তো দূরের কথা আমরা বরং বিদ'আত চর্চাকারী ও মারাত্মক গুনাহগার হতাম।

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে অর্থাৎ বিছমিল্লাহ্ বলে খাওয়া শুরু করা এবং খাওয়া শেষে আল্লাহ্‌র প্রশংসা অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ্ বলার অনুমতি যদি আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে না দিতেন, এ কাজটি যদি শরী'য়ত সম্মত না হতো, আর আমরা যদি তা করতাম (অর্থাৎ খাওয়ার শুরুতে বিছমিল্লাহ্ এবং খাওয়ার শেষে আলহামদুলিল্লাহ্ বলতাম) তাহলে অবশ্যই আমরা বিদ'আত চর্চাকারী ও গুনাহ্‌গার হতাম। কিন্তু আমরা যাতে আল্লাহ্‌র (ﷻ) সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি, তজ্জন্য তিনি আমাদেরকে এ কাজের অনুমতি দিয়েছেন। এ কাজটাকে আমাদের জন্য ছুন্নাত সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং এটা যে আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র (ﷻ) কতো বড় দ্বীনী ইহ্‌ছান ও নি'মাহ্, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ বিষয়টি মানুষ সাধারণত বুঝে না বা বুঝবে না, তবে যদি তারা সঠিকভাবে (আল্লাহ্‌ভিমুখী অন্তর নিয়ে) চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে অবশ্যই এই মহান দ্বীনী নি'মাতের বিষয়টি খুবভালো করেই উপলব্ধি করতে পারবে। আমরা আল্লাহ্‌র (ﷻ) কাছে প্রার্থনা করছি- তিনি যেন এই মহান দ্বীনী নি'মাহ্ আমাদের সবার ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করেন, আমরা সকলেই যেন তাঁর সুমহান সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি।

যাই হোক, এ তো গেল খাদ্য-পানীয় এবং পানাহারের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল

'আলামীনের নি'মাহ্ সমূহের যৎসামান্য বর্ণনা। এবার পানাহার পরবর্তী বিষয় ও ঘটনাবলীর প্রতি আল্লাহ চাহেতো আমরা যৎসামান্য আলোকপাত করব।

আমরা দেখি যে, খাওয়া-দাওয়ার পরে আমাদের গৃহীত খাদ্য ও পানীয় পেট থেকে মল-মূত্র আকারে বেরিয়ে যায়। এর মধ্যেও আমাদের প্রতি শারীরিক ও বস্তুগত এবং শার'য়ী-দ্বীনী আল্লাহ্র অনেক নি'মাহ্ রয়েছে। মোটকথা, প্রস্রাব-পায়খানার মাধ্যমেও আমরা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন প্রদত্ত বস্তুগত ও ধর্মীয় অসংখ্য নি'মাহ্ উপভোগ করে থাকি। যেমন দেখুন! আমরা যা কিছু খাই বা পান করি, সেগুলো যদি আমাদের পেটে জমে বা আটকে থাকতো; প্রস্রাব-পায়খানা না হতো, তাহলে পরিণতি নির্ঘাত মৃত্যুই হতো। কিন্তু আমাদের প্রতি আল্লাহ্র (ﷻ) দয়া-অনুকম্পা বা নি'মাহ্ হলো যে, সেগুলো খুব সহজেই বেরিয়ে যায়।

পেটের মধ্যে পানি ও খাদ্যের যে নালী (পাইপ) থাকে, সেগুলোকে খোলা রাখার জন্য (যাতে পাইপগুলো বন্ধ না হয় এবং ওগুলোর মধ্য দিয়ে খাদ্য বা পানি যাতে সহজেই চলাচল করতে পারে) তন্মধ্যে আল্লাহ ﷻ যে বাতাস রেখে দিয়েছেন, সেই বাতাস বের হওয়ার ব্যবস্থা যদি আল্লাহ ﷻ না করে দিতেন, বাতাস যদি বন্ধ হয়ে যেত বা আটকে যেত, তাহলে পরিণতি কি হতো? পেট ফুলে ফেঁটে যেত এবং মানুষ মারা যেত।

অতএব একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, অতি সহজে প্রস্রাব-পায়খানা ও বাতাস বের হওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা আল্লাহ্র (ﷻ) অনেক বড় বড় নি'মাহ্ উপভোগ করে থাকি।

শুধু তা-ই নয় বরং আরো লক্ষ্য করুন! কিভাবে প্রস্রাব-পায়খানা ও বাতাসকে আল্লাহ ﷻ মানুষের অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রেখে দিয়েছেন। ব্যক্তি তার সময়-সুযোগ মতো তা ত্যাগ করতে পারে, আবার সাময়িকভাবে আটকে রাখতে পারে। প্রস্রাব পায়খানা করার বিষয়ে একটু ভেবে দেখুন! আল্লাহ ﷻ যদি সহজ ও সুগম করে না দিতেন, তাহলে প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা কি কেউ খুলে দিতে পারতো? আল্লাহ ﷻ যদি মানুষকে প্রস্রাব-পায়খানা নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি না দিতেন, তাহলে কেউ কি তা ধরে রাখতে পারতো? অবশ্যই না।

সুতরাং এসবই হলো আমাদের প্রতি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের মহান নি'মাহ্। (আমরা আল্লাহ্র (ﷻ) নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের প্রতি তাঁর এই মহান নি'মাহ্গুলো অব্যাহত রাখেন।) এসব নি'মাতের গুরুত্ব কেবল সেই ব্যক্তিই কিছুটা উপলব্দি করতে পারবে, যে বহুমূত্র (ডায়াবেটিক) কিংবা মারাত্মক কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে আক্রান্ত। আমরা আল্লাহ্র (ﷻ) নিকট এসব অসুখ-বিসুখ থেকে মুক্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

যাই হোক, শারীরিক ও বস্তুগত এসব নি'মাহ্র পাশাপাশি প্রস্রাব-পায়খানা ত্যাগের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র (ﷻ) দ্বীনী নি'মাহ্ও বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হলো প্রস্রাব-পায়খানাস্থলে প্রবেশের প্রাক্কালে এবং সেখান থেকে বের হওয়ার সময় (বের হয়ে) নির্ধারিত যিক্র বা দু'আ রয়েছে, যা পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করা যায়। আল্লাহ ﷻ যদি আমাদেরকে এসব দু'আ পাঠের অনুমতি না দিতেন, অথচ আমরা যদি সেগুলো পাঠ করতাম, তাহলে অবশ্যই আমরা বিদ'আত চর্চাকারী ও গুনাহ্গার হতাম। (কারণ, দ্বীনের মধ্যে যা কিছু নেই এমন কোন কিছু করার অধিকার কারো নেই। যদি কেউ এমন কিছু করে, তাহলে তার সেই কথা বা কাজ দ্বীনের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত: বিদ'আত বলে গণ্য হবে। আর রাছূলুল্লাহ্ ﷺ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রতিটি বিদ'আতই হলো ভ্রষ্টতা এবং প্রতিটি ভ্রষ্টতার ঠিকানা হলো জাহান্নাম।)

আল্লাহ ﷻ তাঁর নাবীর (ﷺ) মাধ্যমে আমাদেরকে এসব দু'আ পাঠের অনুমতি দিয়ে তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছেন। এটা যে আল্লাহ্র (ﷻ) কত বড় নি'মাহ্, তা কেবল প্রকৃত মু'মিনগণই উপলব্ধি করতে পারেন।

আমরা যদি সত্যিকার অর্থে একনিষ্ট মন নিয়ে আল্লাহ্র (ﷻ) ব্যাপক, বিস্তৃত, অগণিত-অসংখ্য, জাগতিক, বস্তুগত, শারীরিক এবং দ্বীনী বা শার'য়ী নি'মাহ্র দিকে তাকাই, তাহলে অনায়াসেই আমরা খুঁজে পাব ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াতের সত্যতা ও যথার্থতা, যেখানে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ -যদি তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা কর, তাহলে তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ। (ছূরা ইবরাহীম- ৩৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না; আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু। (ছূরা আন্নাহ্ল- ১৮)

এসব আয়াতে আল্লাহ ﷻ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- তাঁর শান কি, আর বান্দাহ্র অবস্থা কি, তিনি মানুষের প্রতি কি করছেন আর মানুষ তাঁর প্রতি কি করছে। তিনি (আল্লাহ ﷻ) প্রতিটি মূহুর্তে মানুষের প্রতি দয়া-করুণা-অনুগ্রহ করছেন, আর মানুষ করছে অন্যায়-যুল্ম এবং কুফ্র বা অস্বীকার। মানুষ নিজের প্রতি করছে অন্যায়-যুল্ম, আর আল্লাহ্র নি'মাতকে করছে অস্বীকার।

উপরোক্ত আলোচনা ও দলীল-প্রমাণ থেকে একথা স্পষ্ট যে, মানুষের জীবনের পরতে পরতে রয়েছে আল্লাহ্র (ﷻ) অগণিত-অসংখ্য নি'মাহ্। তন্মধ্যে আমাদের প্রতি আল্লাহ্র (ﷻ) সবচেয়ে বড় নি'মাহ্ হলো- জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি বিষয় কিভাবে পরিচালনা করলে আমাদের দুন্ইয়া ও আখিরাতের জীবন নিরাপদ, সুখী-সমৃদ্ধ ও শান্তিময় হবে, সর্বোপরি কিভাবে আমরা আল্লাহ্র (ﷻ) সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব, সে বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আল্লাহ ﷻ তাঁর নাবীর (ﷺ) মাধ্যমে আমাদেরকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আমাদের ইহ-পরকালের জন্য কল্যাণকর এমন কোন বিষয় নেই, যে বিষয়ে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বলে যাননি। আর আমাদের জন্য অকল্যাণকর বা ক্ষতিকর এমন কোন বিষয় নেই, যে বিষয়ে তিনি আমাদেরকে সতর্ক করেননি। এমনকি প্রস্রাব-পায়খানার নিয়ম-নীতি এবং তাতে ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারের তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জনের বিষয়েও সবিস্তার আমাদেরকে জানিয়ে গেছেন।

এমন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির অধিকারী বলেই তো আমাদের জন্য আল্লাহ্র (ﷻ) মনোনীত দ্বীন ইছলাম হলো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান।

এখন প্রশ্ন হলো- আমরা কিভাবে আল্লাহ্র (ﷻ) এসব নি'মাতের শুক্র আদা করব? এর উত্তর একটাই। আর তাহলো আমাদেরকে আল্লাহ্র (ﷻ) নির্দেশিত এবং রাছূলুল্লাহ্র (ﷺ) প্রদর্শিত নিয়ম-নীতি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বতোভাবে মেনে চলতে হবে। আল্লাহ ﷻ প্রবর্তিত বিধি-বিধান যথাযথভাবে মেনে চলার মাধ্যমেই কেবল আল্লাহ্র (ﷻ) নি'মাতের শুক্র আদা করা যাবে। নতুবা নিজের প্রতি চরম অত্যাচার আর আল্লাহ্র নি'মাতকে অস্বীকার করা হবে।

যেহেতু কোন কিছু মানতে বা পালন করতে হলে অবশ্যই সর্বাগ্রে সে বিষয়ে সঠিক জ্ঞান আর্জন করতে হয়, তাই আমরা আমাদের সুপ্রিয় পাঠকবর্গের সামনে ধারাবহিকভাবে মানুষের জীবন সংশ্লিষ্ট অতি প্রয়োজনীয় কতিপয় বিষয় সম্পর্কে ইছলাম নির্দেশিত সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি দলীল-প্রমাণসহ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরব, ইনশা-আল্লাহ। এ পর্যায়ে এখানে আমরা প্রথমতঃ প্রস্রাব-পায়খানার নিয়ম-পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করছি:-

ইছলামী শরী'য়তে প্রস্রাব-পায়খানার ক্ষেত্রে বেশকিছু আদব-কায়দা ও নিয়ম-নীতি নির্ধারিত রয়েছে, যেগুলো রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর হাদীছ ও তাঁর ছুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত। সেগুলো হলো যথা:-

(১) প্রস্রাবখানা বা পায়খানায় প্রবেশের সময় প্রথমে "বিছমিল্লাহ্" বলা। এ কাজটি ছুন্নাত। এর প্রমাণ হলো- 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব ﷺ হতে বর্ণিত, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- যখন কোন আদম সন্তান প্রস্রাবখানা বা পায়খানায় প্রবেশ করতে যায়, সে যেন "বিছমিল্লাহ্" বলে। তাহলে এটা ("বিছমিল্লাহ্" বলা) তার লজ্জাস্থান ও শাইত্বানের চোঁখের মাঝখানে পর্দা হয়ে যাবে। (জামে' তিরমিযী- ৬০৬। ইবনু মাজাহ্- ২৯৭) {যদিও হাদীছটির ছনদ দুর্বল তবে তার সমর্থনে সমার্থক অন্যান্য হাদীছ রয়েছে, যদ্দরুন এটি গ্রহণযোগ্য}

অতঃপর এই দু'আ পড়া ছুন্নাত:- "আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবা-য়িছ"।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট শাইত্বান নর ও নারী হতে {তাদের অনিষ্ট থেকে} আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সাহীহ্ বুখারী- ১৪২। সাহীহ্ মুছলিম- ৩৭৫)

উপরোক্ত দু'আয় "মিনাল খুবুছি" এর পরিবর্তে "মিনাল খুব্ছি" ও পড়া যাবে। তখন এর অর্থ হবে- হে আল্লাহ! সকল প্রকার অনিষ্ট এবং অনিষ্টকারী বস্তু হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ।

তবে অবশ্যই উপরোক্ত দু'আ প্রস্রাবখানা বা পায়খানায় (টয়লেটে) প্রবেশের ঠিক আগ মূহুর্তে পড়তে হবে। আর যদি খোলা জায়গায় অর্থাৎ প্রস্রাব-পায়খানার জন্য নির্ধারিত নয় এমন স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করতে হয়, তাহলে এক্ষেত্রে পেশাব বা পায়খানা করতে বসার আগেই এই দু'আ পাঠ করতে হবে।

যেহেতু প্রস্রাবখানা-পায়খানা হলো অত্যন্ত নোংরা স্থান, বাহ্যিকভাবে তা যতই পরিষ্কার হোক না কেন, তথাপি সে স্থানটি ময়লা-আবর্জনা বা মল-মূত্র ত্যাগের স্থান। আর নোংরা স্থান হলো খাবীছ শাইত্বানদের আবাসস্থল। তাছাড়া আমরা যদিও শাইত্বানকে দেখিনা কিন্তু শাইত্বান আমাদেরকে ঠিকই দেখতে পায়। তাই রাছূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন- আমরা যেন প্রস্রাব-পায়খানা করতে যেয়ে প্রথমে বিছমিল্লাহ্ বলে শাইত্বানের চোঁখে পর্দা ফেলে দেই, অতঃপর উপরোক্ত দু'আ পাঠের মাধ্যমে শাইত্বান ও তার অনিষ্ট হতে আল্লাহ্র (ﷻ) কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

অনেক সময় শুনা যায়, বিভিন্ন লোক শাইত্বান বা খাবীছ জিন্নাত দ্বারা কষ্ট পাচ্ছেন কিংবা আক্রান্ত হয়েছেন। এসব ঘটনার বেশির ভাগই মূলত প্রস্রাব-পায়খানার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন এবং টয়লেটে প্রবেশের আগে নির্ধারিত দু'আ পাঠের মাধ্যমে শাইত্বান ও তার অনিষ্ট হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা না করার কারণেই ঘটে থাকে।

(২) প্রস্রাবখানা বা পায়খানা (টয়লেট) থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে আর অনির্ধারিত স্থানে বা খোলা জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগ করে থাকলে সেই জায়গা থেকে খানিকটা সরে এসে প্রথমে "গুফরানাকা" (অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি) **বলা। অতঃপর এই দু'আ পাঠ করা ছুন্নাত:-** "আলহামদু লিল্লাহিল লাযী আযহাবা 'আন্নিল আযা ওয়া 'আ-ফানী"।

অর্থ- সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমার থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। এর প্রমাণ হলো-'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত,

তিনি বলেছেন যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ যখন প্রস্রাবখানা বা পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসতেন, তখন তিনি বলতেন:- "গুফরানাকা"। (মুছনাদে ইমাম আহ্মাদ- ৬/১৫৫। ছুনানু আবী দাউদ- ৩০। জামে' তিরমিযী- ৭)

আনাছ ইবনু মালিক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ যখন টয়লেট হতে বের হতেন, তখন তিনি বলতেন:- "আলহামদু লিল্লাহিল লাযী আযহাবা 'আন্নিল আযা ওয়া 'আ-ফানী"। (ছুনানে ইবনে মাজাহ্)

এই হাদীছটির ছনদ যদিও দুর্বল, তবে আবূ যার্ ﷺ থেকে বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য ছনদে এই দু'আটি বর্ণিত রয়েছে। (ছুনানুন্ নাছায়ী। মুসান্নাফু ইবনে আবী শাইবাহ্- ১০। নাতাইজুল আযকার- ১/২১৮)

প্রস্রাব-পায়খানা থেকে বেরিয়ে এসে আল্লাহ্র (ﷻ) নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাঁর (ﷻ) প্রশংসা করার মূলে অনেক কারণ বা হিকমাহ্ রয়েছে, যার বেশিরভাগই আমরা জানিনা বা বুঝিনা। তবে এসব হিকমাহ্র অন্যতম হলো- প্রথমতঃ মল-মূত্র ত্যাগের মাধ্যমে যখন কোন মু'মিন বান্দাহ্ শারীরিকভাবে হালকা ও আরাম অনুভব করে, তখন সে তার গুনাহ্র ভার অনুভব করে, আর তখনই সে আল্লাহ্র (ﷻ) নিকট প্রার্থনা করে- যেভাবে তিনি (ﷻ) তাকে নিজ অনুগ্রহে শারীরিক ভার ও কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, তেমনি যেন তাকে ক্ষমা করে দিয়ে গুনাহ্র ভার ও কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দান করেন।

দ্বিতীয়তঃ যেহেতু আল্লাহ ﷻ অত্যন্ত কষ্টদায়ক বস্তু তার থেকে দূরীভুত করে তাকে যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিয়েছেন, তাই সে আল্লাহ্র এই অনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রশংসা করে থাকে। কেননা যদি আল্লাহ ﷻ নিজ দয়া ও অনুগ্রহে এই যন্ত্রণাদায়ক বস্তুগুলো (প্রস্রাব-পায়খানা তথা মল-মূত্র) তার থেকে অপসারণ বা দূরীভূত না করতেন, যদি এগুলো তার পেটে আটকে থাকতো, তাহলে নির্ঘাত সে মৃত্যুবরণ করতো। সুতরাং এই মহান দয়া ও অনুগ্রহের জন্য তাঁর (ﷻ) প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত।

(৩) প্রস্রাবখানা বা পায়খানায় প্রবেশের সময় প্রথমে বাম পা এবং সেখান থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা বের করা। এ কাজটি মুছ্তাহাব বা উত্তম। যদিও এ বিষয়টির পক্ষে সরাসরি ও সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে ছুন্নাহ্তে বর্ণিত অনুরূপ অন্যান্য বিষয়াদির উপর ক্বিয়াছ করে আয়িম্মাহ্ ও 'উলামায়ে কিরাম এ বিষয়টি নির্ধারণ করেছেন। তারা দেখেছেন যে, মাছজিদ পবিত্র স্থান, তাই রাছূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা এবং এবং সেখান থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা বের করতে বলেছেন। এমনিভাবে মোজা যেহেতু পবিত্র অবস্থায় নাপাকি থেকে বেঁচে থাকার জন্য পরিধান করা হয়, তাই রাছূলুল্লাহ্ ﷺ মোজা পরিধানকারীকে প্রথমে ডান পায়ে অতঃপর বাম পায়ে মোজা পরিধানের নির্দেশ দিয়েছেন। এসব দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র স্থানে কিংবা পবিত্র কাজে অনুপ্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা প্রবেশ করানো এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সময় প্রথমে বাম পা বের করা ছুন্নাত। এছাড়া আরো বেশ কিছু দলীল রয়েছে যদ্বারা ডান হাত ও ডান পায়ের সম্মান ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়। যেহেতু প্রস্রাবখানা বা পায়খানা অত্যন্ত নোংরা জায়গা এবং শাইত্বান-খাবীছের নিবাস, তাই নোংরা স্থানে প্রবেশের সময় প্রথমে বাম এবং সেখান থেকে বেরিয়ে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থানে) আসার সময় প্রথমে ডান পা রাখাটাই উত্তম হবে, ক্বিয়াছ বা সুস্থ-সঠিক বিবেক এ কথারই সাক্ষ্য দেয়।

কিন্তু যেহেতু ছুন্নাহ্ থেকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তাই 'উলামায়ে কিরাম এ কাজটিকে ছুন্নাত না বলে উত্তম বা মুছ্তাহাব বলেছেন।

তবে সাবধান! এ বিষয়টিকে সামনে রেখে কেউ যদি প্রতারিত ও বিভ্রান্ত হয়ে প্রশ্ন করে যে, যেহেতু প্রস্রাব-পায়খানা এমন একটি কাজ, যে কাজটি রাছূলুল্লাহ্ ﷺ প্রতিদিন এক বা একাধিকবার করেছেন, এতদসত্ত্বেও রাছূলুল্লাহ্ ﷺ কিংবা সাহাবায়ে কিরাম ﷺ থেকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কোন বক্তব্য বা বর্ণনা না থাকায় যেহেতু অনুরূপ বিষয়াদির উপর ক্বিয়াছ করে এতদ্বিষয়ে একটি হুক্ম (মুছ্তাহাব) নির্ধারণ করা হয়েছে, তাহলে এরূপ অন্যান্য বিষয়েও ক্বিয়াছ করে হুক্ম নির্ধারণ করা বৈধ হবে না কেন?

তাহলে উত্তরে আমরা বলব, প্রথমতঃ এরূপ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। কেননা যদিও প্রস্রাব-পায়খানার বিষয়টি প্রতিদিন রাছূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এক বা একাধিকবার সংঘটিত হয়েছে, তবে তা লোকচক্ষুর আড়ালে নির্জনে; একাকী হয়েছে। তাই সাহাবায়ে কিরাম থেকে এ বিষয়ে কোন বর্ণনা না থাকাটাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ যদিও বিষয়টি সম্পর্কে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ভাষ্যে কোন প্রমাণ বা নির্দেশনা পাওয়া যায়নি, তবে একাধিক ইশারাতুন্ নাস্ বা ইঙ্গিতবাহী প্রমাণ দ্বারা তা রাছূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে প্রমাণিত।

শুধু তাই নয় বরং দালালাতুন্ নাস্ (অর্থাৎ- অনুরূপ বিষয়ে যে প্রমাণটি রয়েছে, সেই প্রমাণের দাবি, চাহিদা ও বাস্তবতা) দ্বারাও আলোচিত বিষয়টি (প্রস্রাব-পায়খানায় প্রবেশের সময় প্রথমে বাম পা এবং বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা বের করা উত্তম) প্রমাণিত।

অতএব অত্র মাছআলার ক্ষেত্রে যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছে, তা সাধারণভাবে যে কোন মাছআলার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যাবে না। এই নীতি অবলম্বন করতে হলে প্রথমতঃ উক্ত মাছআলা যে ধরন ও প্রকৃতির, সেই মাছআলাটিও অনুরূপ ধরণ ও প্রকৃতির হতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ এই মাছআলার হুক্ম যেভাবে ইশারাতুন্ নাস্, দালালাতুন্ নাস্ ও ক্বিয়াছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, তদ্রুপ সেই মাছআলার হুক্মও দালালাতুন্ নাস্, ইশারাতুন্ নাস্ ও ক্বিয়াছ দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। অন্যথায় তাতে এই নীতি অবলম্বন করা যাবে না।

(৪) নিজ শরীর লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে প্রস্রাব-পায়খানা করা। যদি নির্ধারিত স্থান ব্যতীত এমন কোন স্থানে মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হয় যেখানে আশে-পাশে আড়াল নেয়ার মতো কোন দেয়াল, বন-জঙ্গল, গাছ-পালা, টিলা-পাহাড় ইত্যাদি কোন কিছু না থাকে, তাহলে এক্ষেত্রে শরীর দেখা যাবে না; এতটুকু দূরে লোকচক্ষুর আড়ালে নির্জন-খালি কোন স্থানে প্রস্রাব-পায়খানার কাজ সম্পন্ন করা মুছ্তাহাব। আর যদি আশে-পাশে আড়াল নেয়ার মতো দেয়াল, বন-জঙ্গল, গাছ-পালা বা পাহাড়-টিলা ইত্যাদি কিছু থাকে, তাহলে নিজের পুরো শরীর মানুষ যেন দেখতে না পায় সেভাবে আড়াল করে প্রস্রাব-পায়খানা করা মুছ্তাহাব। **তবে সর্বাবস্থায় নিজের লজ্জাস্থান লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে প্রস্রাব-পায়খানা করা ওয়াজিব।**

এ বিষয়ে প্রমাণ হলো- মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ ﷺ বর্ণিত হাদীছ। তিনি বলেছেন:- অর্থ- আমি কোন এক ছফরে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন- হে মুগীরাহ্! পানির বদনা (পাত্র) নাও। আমি পানির বদনা নিলাম, তারপর তাঁর সাথে বেরিয়ে এলাম। অতঃপর তিনি (রাছূলুল্লাহ্ ﷺ) হাটতে লাগলেন এবং আমার চোঁখের অদৃশ্য হয়ে গিয়ে তাঁর প্রয়োজন সম্পন্ন করলেন ---------- । (সাহীহ্ মুছলিম- ২৭৪। মুছনাদে ইমাম আহ্মাদ - ১৮৭১৮)

সাহীহ্ মুছলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- আমি কোন এক রাতে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে ছিলাম। রাছূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন- তোমার সাথে কি পানি আছে? আমি বললাম- হ্যাঁ (আছে)। তিনি তাঁর বাহন থেকে নেমে হাটতে লাগলেন, এক পর্যায়ে তিনি রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন (আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন)। অতঃপর তিনি ফিরে আসলেন ------। (সাহীহ্ মুছলিম)

তাছাড়া লোকচক্ষুর আড়ালে দূরে নির্জন স্থানে গিয়ে প্রস্রাব-পায়খানা করা- এটা তো স্বাভাবিক শিষ্টাচার, চক্ষু লজ্জা এবং সুস্থ বিবেকেরও দাবি।

(৫) প্রস্রাবখানা বা টয়লেট ব্যতীত অন্য কোথাও প্রস্রাব করার ক্ষেত্রে নরম জায়গা খুঁজে নেয়া উত্তম। কেননা নরম জায়গায় প্রস্রাব করলে শরীরে কিংবা কাপড়ে ছিটা লাগার আশঙ্কা থাকে না। যদিও সাধারণত প্রস্রাবের ছিটা-ফোঁটা কাপড়ে বা শরীরে এসে পড়ার কথা নয়, তবুও সন্দেহপ্রবণ লোকদের মনে শাইত্বান যাতে ওয়াছ্ওয়াছাহ্র (কুমন্ত্রণার) দরজা খুলতে না পারে, তজ্জন্য নরম স্থানে প্রস্রাব করা উত্তম। আর যদি আশে-পাশে নরম জমি না থাকে, তাহলে যতটুকু সম্ভব মাটি ঘেঁষে অর্থাৎ মূত্রযন্ত্রকে যথাসম্ভব মাটির কাছাকাছি নিয়ে এসে প্রস্রাব করা উত্তম, এতে করে শাইত্বানের ওয়াছ্ওয়াছাহ্ থেকে বেঁচে থাকা যাবে। (দেখুন! শারহু মুনতাহাল এরাদা-ত- ১/৩০)

(৬) প্রস্রাব-পায়খানায় যাওয়ার সময় আল্লাহ্র (ﷻ) নাম বা আল্লাহ্র (ﷻ) যিক্র লিখা রয়েছে এমন কিছু সঙ্গে না নেয়া। এরকম কিছু সঙ্গে নিয়ে প্রস্রাব-পায়খানা করতে যাওয়া শরী'য়তের দৃষ্টিতে খুবই অপছন্দনীয় কাজ। প্রত্যেক মুছলমানের কর্তব্য হলো- সার্বিকভাবে আল্লাহ্র সুমহান নাম ও গুণাবলির পবিত্রতা রক্ষা করা। তাই অপবিত্র স্থানে আল্লাহ্র (ﷻ) নাম বা যিক্র লিখা রয়েছে এমন কিছু নিয়ে প্রবেশ করা উচিত নয়।

অনেক 'উলামায়ে কিরামের অভিমত হলো- ক্বোরআনে কারীম নিয়ে কিংবা ক্বোরআনে কারীমের অংশ বিশেষ লিখা রয়েছে- তা কাপড় বা অন্য কিছু দিয়ে মোড়ানো বা আচ্ছাদিত থাকুক অথবা উন্মুক্ত থাকুক, সর্বাবস্থায় এরকম কিছু নিয়ে প্রস্রাব-পায়খানায় প্রবেশ করা হারাম।

তবে যদি এমন কোন বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্র (ﷻ) নাম লিখা থাকে, যেটিকে ঐ মূহুর্তে বাইরে রেখে প্রস্রাব-পায়খানায় যাওয়ার কোন সুযোগ নেই, তাহলে এমতাবস্থায় সেটি সাথে নিয়ে যাওয়া শরী'য়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় কাজ বলে গণ্য হবে না। যেমন- টাকা-পয়সার কাগুজে নোট বা ধাতব মুদ্রার মধ্যে কিংবা অতিপ্রয়োজনীয় বা মূল্যবান কোন ডকুমেন্ট বা দলীল-পত্রের মধ্যে যদি আল্লাহ্র নাম মুদ্রিত, খঁচিত বা লিখা থাকে, আর প্রস্রাব-পায়খানার সময় সেটি বাইরে নিরাপদে রেখে যাওয়ার কোন সুযোগ না থাকে, (সেটি বাইরে রেখে গেলে হেরে যাবে, চুরি হয়ে যাবে অথবা বিনষ্ট হয়ে যাবে) তাহলে এমতাবস্থায় সেটি সাথে নিয়ে প্রবেশ করা জায়িয তথা বৈধ রয়েছে।

(৭) কেউ দেখুক বা না-ই দেখুক, সর্বাবস্থায় প্রস্রাব-পায়খানায় বসতে যাওয়ার আগে কাপড় না উঠানো।

যদি কেউ প্রস্রাব-পায়খানায় বসার আগেই কাপড় উঠায়, তাহলে শরী'য়তের দৃষ্টিতে এর হুক্ম নির্ভর করে ব্যক্তির আশপাশের অবস্থার উপর। প্রথমতঃ যদি আশেপাশে এমন কেউ থাকে যে তাকে দেখতে পাচ্ছে, তাহলে এমতাবস্থায়

প্রস্রাব-পায়খানায় বসার আগে কাপড় উঠানো হারাম। কেননা এতে জনসমক্ষে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করা হয়, অথচ রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। আবূ ছা'য়ীদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- কোন পুরুষ যেন কোন পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়। (সাহীহ্ মুছলিম, হাদীছ নং- ৩৩৮)

দ্বিতীয়তঃ যদি আশেপাশে কেউ না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় প্রস্রাব-পায়খানায় বসার আগে কাপড় উঠানোর বিষয়ে 'উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ এটাকে জায়িয, কেউ মাকরূহ্ এবং কেউ হারাম বলেছেন। তবে এরূপস্থলে মাকরূহ্ হওয়ার পক্ষের অভিমতটাই অধিক জোরালো। কেননা যদিও এখানে কাপড় খোলা বা উঠানো হচ্ছে একটা বৈধ কারণে, তবে যেহেতু তা করা হচ্ছে যথাযথ প্রয়োজনীয় সময়ের আগে, তাই এটাকে জায়িয বা হারাম না বলে মাকরূহ্ বলাটাই অধিকতর যথার্থ বলে মনে হয়। আল্লাহ্-ই (ﷻ) সর্ববিষয়ে সঠিক ও সর্বাধিক জ্ঞাত

এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন, আর তা হলো- বিশেষ প্রয়োজনে কিংবা অসুবিধা বশতঃ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়িয। তবে এক্ষত্রে দু'টি শর্ত রয়েছে। প্রথমতঃ- নাপাকী থেকে শরীর ও পোষাক বাঁচিয়ে রাখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ- মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে বা আড়ালে করতে হবে। এ দু'টি বিষয় যদি নিশ্চিত করা যায়, তাহলেই কেবল দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়িয হবে, নতুবা তা জায়িয হবে না।

এর প্রমাণ হলো- হুযাইফাহ্ ﷺ বর্ণিত হাদীছ, তিনি বলেছেন যে, একদা রাছূলুল্লাহ্ ﷺ কোন এক জনপদের (জনবসতির) আবর্জনার স্তুপের নিকট এসে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেন। (সাহীহ্ বুখারী, হাদীছ নং- ২২৪। সাহীহ্ মুছলিম, হাদীছ নং- ২৭৩)

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় 'উলামায়ে কিরাম বলেছেন যে, যেহেতু ঐ আবর্জনা স্তুপটির সন্নিকটে কিছু লোক সমবেত ছিল, তারা রাছূলুল্লাহ্-কে (ﷺ) দেখছিল। তিনি যদি তাদেরকে পিছনে রেখে বসে ময়লার স্তুপের উপর প্রস্রাব করতেন, তাহলে এমতাবস্থায় তাকে নিচে বসে উচু জায়গায় প্রস্রাব করতে হত। কেননা ময়লার স্তুপ স্বভাবতই উঁচু ছিল। আর এতে করে প্রস্রাবের ছিটা এবং ময়লা এসে নির্ঘাত তাঁর কাপড়ে বা শরীরে লাগতো। তাই এরূপ করা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে যদি আবর্জনার স্তুপটিকে পিছনে রেখে বসে প্রস্রাব করতেন, তাহলে লোকজনের সামনা-সামনি হয়ে যেত। যদ্দরুন এরূপ করাও ছিল রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর পক্ষে অসম্ভব। তাই এমতাবস্থায় লোকজনকে পিছনে রেখে প্রস্রাবের ছিটা ও ময়লা থেকে বাঁচার জন্য দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না, বিধায় রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এমনটি করেছিলেন।

কোন কোন 'উলামায়ে কিরাম বলেছেন যে, বিশেষ শারীরিক অসুবিধা বশতঃ রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এমনটি করেছিলেন।

তবে যাই হোক, যেহেতু বিষয়টি রাছূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে প্রমাণিত, অতএব বিশেষ প্রয়োজন বা অসুবিধা বশতঃ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়িয। এ ব্যাপারে 'উলামায়ে কিরামের কারো কোন দ্বিমত নেই।

(৮) প্রস্রাব-পায়খানায় বসে নিরব থাকা। সেখানে বসে কোনরূপ কথা-বার্তা বলা মাকরূহ্। এর প্রমাণ হলো- 'আব্দুল্লাহ্ ইবনু 'উমার ﷺ হতে বর্ণিত যে- অর্থ- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ পেশাব করছিলেন, এমতাবস্থায় এক লোক তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, তিনি তাকে (রাছূলুল্লাহ্ ﷺ-কে) ছালাম করলেন, কিন্তু তিনি (রাছূলুল্লাহ্ ﷺ) তার জাওয়াব দিলেন না। (সাহীহ্ মুছলিম- ৩৭০)

আমরা সকলেই জানি যে, ছালামের জাওয়াব দেয়া হলো ওয়াজিব। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যেহেতু ঐ অবস্থায় রাছূলুল্লাহ্ ﷺ ছালামের জাওয়াব দেননি, তাতে প্রমাণিত হয় যে, প্রস্রাব-পায়খানায় বসা অবস্থায় কথা বলা তো দূরের কথা, ছালামের উত্তর দেয়াও ঠিক নয়। তবে কেউ যদি কাউকে এমতাবস্থায় ছালাম দিয়ে দেয়, তাহলে প্রস্রাব-পায়খানা শেষে সেখান থেকে বেরিয়ে ছালামের জাওয়াব দেয়া আবশ্যক। রাছূলুল্লাহ্ ﷺ প্রস্রাব শেষে ছালাম প্রদানকারীর ছালামের জাওয়াব দিয়েছিলেন। মুহাজির ইবনু ক্বোনফুয ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, অর্থ- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ প্রস্রাব করতেছিলেন এমতাবস্থায় তিনি (মুহাজির ইবনু ক্বোনফুয ﷺ) তাঁর (রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর) নিকট এলেন এবং তাকে (রাছূলুল্লাহ্ ﷺ-কে) ছালাম করলেন। রাছূলুল্লাহ্ ﷺ (প্রস্রাব শেষে) অযূ সম্পন্ন করার পর তার ছালামের জাওয়াব দিলেন। অতঃপর তাকে কারণ (ছালামের জাওয়াব প্রদানে বিলম্ব করার কারণ) দর্শালেন। তিনি বললেন:- আমি অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করতে অপছন্দ করি (তাই পবিত্র হয়ে তোমার ছালামের জাওয়াব প্রদান করি)। (দেখুন! মুছনাদে ইমাম আহ্মাদ- ৪/৩৪৫। আবূ দাউদ- ১৭। নাছায়ী- ৩৮। ইবনু মাজাহ্- ৩৫০। ফাতহুল বারী- ৬৩২০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা।)

অনেক স্থানে দেখা যায় যে, পাশাপাশি দু'জন লোক প্রস্রাব বা পায়খানা করতে বসে একজন আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছে এবং পরস্পর কথাবার্তা বলছে। অথচ এ কাজটি সম্পূর্ণরূপে হারাম। রাছূলুল্লাহ্ ﷺ জানিয়ে দিয়েছেন যে, যখন দু'জন লোক এরূপ করে (অর্থাৎ প্রস্রাব বা পায়খানায় বসে একে অপরের লজ্জাস্থানের দিকে তাকায় এবং পরস্পর কথাবার্তা বলে) তখন আল্লাহ ﷻ এ কাজের জন্য তাদেরকে প্রচন্ড ঘৃণা করেন। (মুছতাদরাকে হা-কিম- ১/১৫৭। মুছনাদে ইমাম আহ্মাদ- ৩/৩৬)

তবে যদি একে অপরের লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়, শুধু কথা-বার্তা বলে, তাহলে তা একান্ত যদি হারাম কাজ নাও হয়, তবুও নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত একটি কাজ।

মোটকথা, প্রস্রাব-পায়খানায় বসে একে অপরের সাথে কথা বলাও আদৌ উচিত নয়। তবে বিশেষ অসুবিধা বা একান্ত প্রয়োজন বশতঃ কথা বলা যাবে, তাতে আল্লাহ চাহেতো কোন অসুবিধা নেই।

(৯) কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ বা প্রাণীর গর্তে কিংবা ডোবায় প্রস্রাব-পায়খানা না করা। এরূপ স্থানে প্রস্রাব পায়খানা করা মাকরূহ্। এমনকি পানির অভাবে যমীনে যে ফাটল দেখা দেয়, সেইসব ফাটলেও প্রস্রাব-পায়খানা করা মাকরূহ্। এর প্রমাণ হলো- 'আব্দুল্লাহ্ ইবনু ছারজিছ ﷺ এর সূত্রে ক্বাতাদাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, অর্থ- "রাছূলুল্লাহ্ ﷺ গর্তে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন"।

ক্বাতাদাহ্-কে (রাহিমাহুল্লাহ্) জিজ্ঞেস করা হলো:- গর্তে প্রস্রাব করতে নিষেধ করার কারণটা কি হতে পারে? তিনি বললেন যে, বলা হয়- "গর্ত হলো জিন্নাতের বাসস্থান"। (মুছনাদে ইমাম আহ্মাদ- ৫/৮২। মুছতাদরাকে হা-কিম- ১/১৮৬)

এছাড়া মাকরূহ্ হওয়ার পিছনে বাহ্যিক আরেকটি কারণ এটাও হতে পারে যে, সাধারণত: মাটিতে গর্তের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কীট-পতঙ্গ, সাপ-বিচ্ছু, ইঁদুর ইত্যাদি ছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের বন্য প্রাণী বসবাস করে থাকে। তাই সেখানে প্রস্রাব-পায়খানা করা হলে- একদিকে যেমন একটি প্রাণীর বাসস্থান বিনষ্ট করা হবে অথচ এ কাজটি মোটেও উচিত নয়, অন্যদিকে গর্তমধ্যস্থ প্রাণীটি গর্ত থেকে বের হয়ে সেখানে প্রস্রাব-পায়খানারত ব্যক্তিকে কামড়ে দিতে পারে বা আক্রমণ করতে পারে, নতুবা প্রাণীটি দ্রুত গর্ত থেকে বের হয়ে আসতে পারে, আর এতে করে সেখানে প্রস্রাব-পায়খানারত ব্যক্তির শরীরে বা জামা কাপড়ে প্রস্রাব-পায়খানার ছিটা লেগে যেতে পারে। এসব কারণে এবং সর্বোপরি ক্বাতাদাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণিত উপরোক্ত বর্ণনাটির কারণে (গর্ত হলো জিন্নাতের বাসস্থান) ডোবায়, গর্তে বা মাটির ফাটলে প্রস্রাব-পায়খানা করা শরী'য়তের দৃষ্টিতে মাকরূহ্ বা অপছন্দনীয় কাজ।

তবে হ্যাঁ, বিশেষ প্রয়োজন ও অসুবিধা হলে কিংবা ঐ মূহুর্তে প্রস্রাব-পায়খানার জন্য যদি বিকল্প কোন জায়গা না পাওয়া যায়, তাহলে এরূপ স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করা মাকরূহ্ বলে গণ্য হবে না। (আল্লাহু আ'লাম)

১০) ডান হাত দিয়ে প্রস্রাব বা পায়খানার রাস্তা স্পর্শ না করা। মল বা মূত্র ত্যাগকারীর জন্য ডান হাত দিয়ে স্বীয় প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা স্পর্শ করা মাকরূহ্। এ বিষয়ে 'উলামায়ে কিরামের কারো কোন দ্বিমত নেই। এর প্রমাণ হলো:- আবূ ক্বাতাদাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- তোমাদের কেউ যেন প্রস্রাব করার সময় মূত্রযন্ত্রকে ডান হাত দিয়ে না ধরে এবং মল ত্যাগ করে ডান হাত দিয়ে যেন না মুছে। আর পানির পাত্রে তোমাদের কেউ যেন শ্বাস না ফেলে। (সাহীহ্ বুখারী- ১৫৩। সাহীহ্ মুছলিম- ২৬৭)

এই হাদীছের ভিত্তিতে অনেক 'উলামায়ে কিরামের অভিমত হলো- যেহেতু প্রস্রাব করার সময় প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও উপরোক্ত হাদীছে ডান হাত দিয়ে মুত্রযন্ত্রকে ধরতে নিষেধ করা হয়েছে, সুতরাং বিনা প্রয়োজনে ডান হাতে প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা ধরা বা মুছা যে নিষিদ্ধ হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

(দেখুন! ফাতহুল বারী- ১/২৫৪। আল ইনসাফ- ১/২০৯)

যদিও সাধারণ অবস্থায় ডান হাতে মুত্রযন্ত্রকে ধরা বা মুছা নিষিদ্ধ কি-না, এ বিষয়ে 'উলামায়ে কিরামের মতবিরোধ রয়েছে, তবে বিনা প্রয়োজনে সাধারণ অবস্থায়ও ডান হাতের সম্মান রক্ষার্থে ডান হাত দিয়ে না ধরা বা স্পর্শ না করাই উত্তম। **প্রস্রাব-পায়খানার পর ডান হাত দিয়ে ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা কিংবা পানি ব্যবহার করাও মাকরূহ্।** এর প্রমাণ হলো- আবূ ক্বাতাদাহ্ ﷺ বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছ। তাতে পায়খানা করার পর ডান হাত দিয়ে (পায়খানার রাস্তা) মুছতে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন। তবে এসব ক্ষেত্রে কারও যদি ডান হাত ব্যবহারের একান্ত প্রয়োজন হয়, যেমন- কারো যদি বাম হাত কাটা কিংবা পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়, তাহলে এমতাবস্থায় তার জন্য ডান হাত ব্যবহার করা মাকরূহ্ নয়। {চলবে ইনশা-আল্লাহ}

সূত্র:-

১) আশ্শারহুল মুমতি' 'আলা যাদিল মুছতাক্বনি'- লিশ্শাইখ আল 'আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল 'উছাইমীন।

২) আল মুলাখ্খাসুল ফিক্বহী- লিশ্শাইখ ড. সালিহ ইবনু ফাওযান আল ফাওযান।

পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাই পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত সালাতই হবে না।

ত্বাহারাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- দৃশ্যমান ও অদৃশ্য তথা বাহ্যিক ও অর্থগত নাপাকী থেকে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন করা।

শরী'য়তের পরিভাষায় ত্বাহারাত অর্থ হলো- অপবিত্রতা মুক্ত হওয়া এবং নাপাকী দূর করা। বাহ্যিক বা দৃশ্যমান নাপাকী দূর করার উপায় হলো- পবিত্রতা অর্জনের নিয়্যাত বা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে পানি ব্যবহার করা। যদি বড় ধরনের অপবিত্রতা বা নাপাকী হয়ে

থাকে, তাহলে এ থেকে পবিত্রতা অর্জনের উপায় হলো- সমস্ত শরীর পানি দিয়ে শরী'য়ত নির্দেশিত নিয়মে ধৌত করা অর্থাৎ গোছল করা। আর ছোট রকমের নাপাকী হয়ে থাকলে শরী'য়ত নির্ধারিত শরীরের চারটি অঙ্গ শরী'য়ত নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী ধৌত করা অর্থাৎ অযূ করা। ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াতে যাবে, তখন তোমাদের মুখমন্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হাতগুলি ধৌত করো আর তোমাদের মাথা মাছাহ্ করো এবং টাখনু পর্যন্ত (গিট বা টাখনু সহ) তোমাদের পা গুলো ধৌত করো। (ছূরা আল মা-ইদাহ্- ৬)

আল্লাহ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- আর যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহলে (গোছল করে) পবিত্রতা অর্জন করো। (ছূরা আল মা-ইদাহ্- ৬)

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- এবং তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তদ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য।

(ছূরা আল আনফাল- ১১)

তবে বড় নাপাকী হোক বা ছোট নাপাকী; সর্বাবস্থায় যদি পানি না পাওয়া যায় কিংবা কেউ যদি পানি ব্যবহারে অক্ষম-অপারগ হয়, তাহলে তাকে শরী'য়ত নির্দেশিত নিয়মে মাটি ব্যবহারের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ - আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা ছফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা করে আসে, কিংবা তোমরা যদি নারী স্পর্শ করো কিন্তু পরে যদি পানি না পাও, তাহলে পাক-পবিত্র মাটি অন্বেষণ করো এবং তদ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও তোমাদের হাতগুলো মাছাহ করে নাও। (ছূরা আন্নিছা- ৪৩)

যেহেতু পবিত্রতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো পানি, তাই পানি সম্পর্কে দু-একটি বিষয় জেনে রাখা আবশ্যক। আর তা হলো- বৃষ্টির পানি হোক, বরফ গলা পানি হোক, সাগর-নদী-ঝর্ণা বা কুঁয়ার পানি হোক, যদি তাতে পানির প্রাকৃতিক-স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বিদ্যমান থাকে, তাহলে সেই পানি পবিত্র এবং তদ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে। এ বিষয়ে 'উলামায়ে কিরামের কারো কোন দ্বিমত নেই।

পক্ষান্তরে পানির মৌলিক তিনটি বৈশিষ্ট্যের (ঘ্রাণ, স্বাদ ও রং) যে কোন একটিও যদি নাপাক কোন বস্তু মিশ্রিত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সেই পানি ব্যবহার করা জায়িয হবে না, কেননা তা নাপাক এবং তদ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে না। এ বিষয়েও 'উলামায়ে কিরামের কারো কোন দ্বিমত নেই। আর যদি পানির উপরোক্ত তিনটি গুণাবলীর মধ্যে যে কোন একটি গুণ পবিত্র কোন বস্তু যেমন- গাছের বা বাঁশের পাতা, সাবান, পটাশ, নীল ইত্যাদি কোন কিছু মিশ্রিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এই পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে কি-না, এ বিষয়ে 'উলামায়ে কিরামের মতবিরোধ রয়েছে। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে- মিশ্রিত পবিত্র বস্তুটি যদি পানির উপর প্রাধান্য না পেয়ে থাকে অর্থাৎ গুণ, মান বা পরিমাণে যদি মিশ্রিত বস্তুটি পানি থেকে বেশি না হয় এবং বস্তুটি পানির সাথে মিশ্রিত হওয়ার পরও যদি ঐ পানিকে পানি-ই বলা হয়; সেটি অন্য নাম ধারণ না করে, তাহলে সেই পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা জায়িয। কেননা ছূরা আন্নিছা'র তেতাল্লিশ নং আয়াতে তাইয়াম্মুমের নির্দেশ প্রদানকালে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- যদি তোমরা পানি না পাও --------। (ছূরা আন্নিছা- ৪৩)

এ আয়াতে সুনির্দিষ্ট না করে সাধারণভাবে পানির কথা বলা হয়েছে। তাতে পানির বিশেষ কোন ধরন বা প্রকারের কথা বলা হয়নি। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কোন তরল পদার্থকে শুধু "পানি" বলা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি উল্লেখিত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত পানি বলে গণ্য হবে এবং তদ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়িয হবে, নচেৎ নয়।

ইবনু হুবাইরাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন:- এ বিষয়ে সকল 'উলামায়ে কিরাম একমত যে, যাদের উপর নামায ফারয এমন প্রতিটি লোকের জন্য পানি পাওয়া গেলে এবং পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব। আর পানি না পাওয়া গেলে কিংবা তা ব্যবহারে সক্ষম না হলে পানির বদলে পবিত্র মাটি দিয়ে শরী'য়ত নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই পবিত্রতা অর্জন না করে নামায (সালাত) আদায় করা যাবে না।

পবিত্রতা অর্জনের প্রতি দ্বীনে ইছলামের এরকম গুরুত্বারোপ থেকে একদিকে যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার ধর্ম ইছলামের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, তেমনি দ্বীনে ইছলামের দ্বিতীয় রুক্ন সালাতেরও মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। কেননা সালাত হলো এমন এক প্রকার 'ইবাদত, যাতে বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ বা অর্থগত উভয় প্রকার নাপাকী ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত অনুপ্রবেশ করা যায় না।

অভ্যন্তরীণ তথা অর্থগত নাপাকী ও অপবিত্রতা হলো শির্ক। নামায আদায় করতে হলে সর্বাগ্রে সর্বক্ষেত্রে (প্রতিপালকত্বে, 'ইবাদতে এবং আল্লাহ্র সুমহান নাম ও গুণাবলীতে) সর্বতোভাবে আল্লাহ্র ﷻ একত্ব অর্থাৎ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং 'ইবাদতকে আল্লাহ্র জন্যে খাঁটি ও খালিস করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নাপাকী তথা শির্ক থেকে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে।

আর বাহ্যিক অপবিত্রতা ও নাপাকী থেকে পানি কিংবা তার স্থলাভিষিক্ত বস্তু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। এই উভয় প্রকার পবিত্রতা অর্জনের পরই কেবল সালাত সম্পাদন করা যাবে।

উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করলে 'ইবাদত পালন করা সহজ হয়, 'ইবাদতে পূর্ণতা আসে এবং তা সহজ-সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা যায়। ইমাম আহ্মাদ রাহিমাহুল্লাহ্ জনৈক সাহাবীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে:- অর্থ- একদা রাছূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের (সাহাবায়ে কেরাম- ﷺ কে) নিয়ে ফাজ্রের সালাত আদায় করেন। তিনি তাতে ছূরা আর্রূম তিলাওয়াত করেন। তবে তাতে (তিলাওয়াতে) তাঁর বিভ্রম বা বিভ্রাট ঘটে। নামায শেষে মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন- নিশ্চয় ক্বোরআন তিলাওয়াত করতে যেয়ে আমাকে জট লাগিয়ে দেয় (বিভ্রাট বা বিভ্রম ঘটায়)। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আমাদের সাথে সালাত আদায় করে; যারা উত্তমরূপে অযূ করে না (আর এ কারণেই আমার এমনটি হয়ে থাকে)। অতএব যারা আমাদের সাথে সালাত আদায় করতে আসবে, তারা যেন সঠিক-সুন্দরভাবে অযূ সম্পন্ন করে।

(মুছনাদে ইমাম আহমাদ)

ক্বোবা মাছজিদবাসীগণ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতেন বলে আল্লাহ ﷻ ক্বোরআনে কারীমে তাদের প্রশংসা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- তাতে এমন কতক লোক রয়েছে যারা উত্তমরূপে পবিত্র হতে পছন্দ করে। আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। (ছূরা আত্তাওবাহ্- ১০৮) যখন তাদেরকে (ক্বোবা মাছজিদবাসীদেরকে) তাদের পবিত্রতা অর্জনের ধরন সম্পর্কে (কিভাবে তাঁরা পবিত্রতা অর্জন করেন) জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁরা বললেন: অর্থ- আমরা পাথর (ঢিলা) ব্যবহারের পরপর পানিও ব্যবহার করে থাকি। (মুছনাদে বায্যার)

মোটকথা, পবিত্রতা অর্জনের মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম। এটা প্রত্যেক মুছলমানের জীবনে এক অপরিহার্য বিষয়। দ্বীনে ইছলামে সবচেয়ে বড় 'ইবাদত সালাত। আর এই সালাতের শুদ্ধতা নির্ভর করে পবিত্রতা অর্জনের উপর। সালাত ছাড়াও আরো অনেক প্রকার 'ইবাদত রয়েছে, যেগুলো ত্বাহারাত তথা পবিত্রতা অর্জনের উপর নির্ভরশীল। সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে পারলেই কেবল সালাত এবং এসব অন্যান্য 'ইবাদত সঠিকভাবে আদায় হবে। অন্যথায় তা আদায় হবে না। তাই ত্বাহারাত বা পবিত্রতা বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা এবং পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে খুবই যত্নবান হওয়া প্রত্যক মুছলমানের উপর ওয়াজিব।

সূত্র:- **আল মুলাখ্খাসুল ফিক্বহী**

ড. আশ্শাইখ সালিহ্ ইবনু ফাওযান আল ফাওযান।

দ্বীনে ইছলাম সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করতে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো পড়ুন

১) ইমাম আহ্মাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ্) রচিত, বাংলা ভাষায় অনুবাদিত প্রখ্যাত গ্রন্থ "ছুন্নাতের মৌলনীতি"।

২) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ছুলাইমান আত্ তামীমী (রাহিমাহুল্লাহ্) প্রণীত এবং সুপ্রসিদ্ধ 'আলিমে দ্বীন শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ্ আল 'উছাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ্) এর ব্যাখ্যাকৃত, বাংলা ভাষায় অনুবাদিত "তিনটি মৌলনীতির ব্যাখ্যা"।

৩) দ্বীনী দা'ওয়াতের সঠিক নীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পড়ুন: বর্তমান বিশ্বে 'ইলমুল জারহ্ ওয়াত্ তা'দীলের অন্যতম 'আলিম- আশ্শাইখ রাবী' ইবনু হাদী আল মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ্) এর লিখিত, বাংলা ভাষায় অনুবাদিত অনবদ্য গ্রন্থ- "নাবীদের ('আলাইহিমুছ্ ছালাম) দা'ওয়াতী নীতি; বিবেক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ।

ইছলামী-জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য ত্রৈমাসিক

রাবী'উল আওয়াল– ১৪৩৫ হিজরী। মাঘ– ১৪২০ বাংলা। জানুয়ারি– ২০১৪ ইংরেজী। পৃষ্ঠা সংখ্যা–১২

বিদ'আত পরিচিতি

(১ম পর্ব)

মূল: আল ইমাম আবূ ইছহাক্ব আশ্‌শাত্বিবী

বিদ'আত শব্দের শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ:-
'আরবী বিদ'উন ধাতু থেকে "বিদ'আহ্" বা "বিদ'আতুন" শব্দটি গৃহীত। "বিদ'উন" অর্থ হলো- অপূর্ব আবিষ্কার বা পূর্ববর্তী কোন নমুনা অনুসরণ ব্যতীত নব-আবিষ্কার বা উদ্ভাবন। এই অর্থেই ক্বোরআনে কারীমে ছূরা বাক্বারাহ্ এর ১১৭ নং আয়াতে আল্লাহ সبحانه وتعالى তাঁর নিজের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- আছমানসমূহ ও যমীনের (পূর্ববর্তী কোন নমুনা অনুসরণ ব্যতীত) নব-উদ্ভাবক।

এই একই অর্থে ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ সبحانه وتعالى ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- হে নাবী! আপনি বলে দিন যে, আমি তো কোন নতুন রাছূল নই। (ছূরা আল আহক্বাফ- ৯)

আয়াতে বর্ণিত "বিদ'আম মিনার রুছুলি" (আমি তো **কোন নতুন রাছূল** নই) কথাটির অর্থ হলো- আমি মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্‌র বার্তা নিয়ে প্রথম আগমনকারী কোন নতুন রাছূল নই, বরং আমার পূর্বে আরো অনেক নাবী রাছূল আগমন করেছেন।

ক্বোরআনে কারীমে বর্ণিত উপরোক্ত অর্থে বিদ'উন থেকে উদগত বিদ'আত শব্দের অর্থ হলো- অপূর্ব আবিষ্কৃত বিষয়, পূর্ববর্তী কোন নমুনা অনুসরণ ব্যতীত নতুন আবিষ্কৃত বিষয় কিংবা প্রথম আবিষ্কৃত বিষয়। (আল ই'তিসাম লিশ্ শাত্বিবী)

বিদ'আতের এই অর্থটি তার পরিভাষাগত অর্থেও বিদ্যমান।

শরী'য়তের পরিভাষায় বিদ'আত কাকে বলে?
'উলামায়ে কিরাম শরী'য়তের পরিভাষায় "বিদআত" এর বিভিন্ন সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের বর্ণনাকৃত সেসব সংজ্ঞা অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে প্রায় এক ও অভিন্ন এবং একটি অপরটির সম্পূরক।

শাইখুল ইছলাম ইবনু তাইমিয়াহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন:- ধর্মের মধ্যে বিদ'আত হলো- এমন কোন বিষয় যেটি আল্লাহ সبحانه وتعالى ও তাঁর রাছূল ﷺ প্রবর্তন করেননি। অর্থাৎ যে বিষয়ে ওয়াজিব সূচক কিংবা মুছ্তাহাব সূচক কোন নির্দেশ প্রদান করেননি। (ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়াহ্- ৪/১০৭-১০৮)

তিনি আরো বলেছেন:- ক্বোরআন, ছুন্নাহ্ ও ছালাফে সালিহীনের (رضي الله عنهم) ঐকমত্যের বিরোধী প্রতিটি 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস ও 'ইবাদত হলো বিদ'আত। যেমন- খাওয়ারিজ, রাওয়াফিয, ক্বাদরিয়্যাহ, জাহ্মিয়্যাহ্ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কথা-বার্তা ও 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস। এমনিভাবে মাছজিদে তবলা ও গান-বাজনার মাধ্যমে 'ইবাদত করা, দাড়ী মুন্ডানোর মাধ্যমে, গাঁজা বা নেশা জাতীয় দ্রব্য পানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র 'ইবাদত বা নৈকট্য কামনা করা ইত্যাদি কর্মকান্ড যেগুলো ক্বোরআন-ছুন্নাহ্‌র বিরোধিতাকারী বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের লোকেরা করে থাকে, এ সবই হলো বিদ'আত। (ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়াহ্- ১৮/৩৪৬)

'আল্লামা শাত্বিবী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন:- **"বিদ'আত হলো- দ্বীনের মধ্যে নব-উদ্ভাবিত এমন কোন পথ, যেটি বাহ্যিকভাবে শরী'য়ত প্রবর্তিত পথ বা বিষয় সদৃশ মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি শরী'য়তের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং যে পথ অনুসরণের দ্বারা আল্লাহ্‌র অধিক নৈকট্য লাভের ইচ্ছা পোষণ করা হয়"।**

উক্ত সংজ্ঞায় বর্ণিত **"দ্বীনের মধ্যে"** বাক্যটি দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে যে, জাগতিক অর্থাৎ দুন্‌ইয়াওয়ী বিষয়ে নব-আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত কোন পন্থা বা বিষয় বিদ'আতের পর্যায়ে পড়ে না এবং সেটাকে বিদ'আত বলা যাবে না। যেমন- নতুন নতুন শহর-বন্দর, কল-কারখানা ও শিল্প গড়ে তোলা, নতুন প্রযুক্তি ও মেশিনারীজ আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করা। এসবকে বিদ'আত বলা যাবে না। কেননা এগুলো দ্বীনী কোন বিষয় নয় বরং এগুলো হলো নিছ্ক জাগতিক বিষয়। সংজ্ঞায় বর্ণিত "নব-উদ্ভাবিত" বাক্যটি দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে যে, দ্বীনের মধ্যে (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর বাণী

আবূ মূছা আল আশ'আরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- আল্লাহও যালিমদের ঢিল দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাকে ধরেন তখন আর ছাড়েন না। (বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন) এরপর তিনি (রাছূলুল্লাহ ﷺ ক্বোরআনে কারীমের) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন- অর্থাৎ:- আর এরকমই বটে আপনার পালনকর্তার পাকড়াও, যখন তিনি কোন জনপদবাসীকে পাকড়াও করেন তাদের যুল্‌মের দরুন, নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, অত্যন্ত কঠিন।

(ছূরা হুদ-১০২) {সাহীহ্ বুখারী-৪৬৮৬}

মীলাদ বিষয়ক কতিপয় সংশয় নিরসন

মূল: ড. আশ্‌শাইখ সালিহ্ ইবনু ফাওযান আল ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ্)

১) যারা মীলাদ মাহ্‌ফিল বা 'ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করে থাকেন, তাদের দাবি হলো- এধরনের মীলাদ মাহ্‌ফিল পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নাবী ﷺ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তাই তা বিদ'আত হতে পারে না।

কিন্তু তাদের এ দাবিটি আদৌ সঠিক নয়। এটি একটি বিভ্রান্তকর দাবি। কেননা প্রকৃত অর্থে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হলো- তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলা এবং তাকে মনে-প্রাণে ভালোবাসা। বিদ'আত, কুসংস্কার চর্চা করে কিংবা রাছূলের অবাধ্যতা ও নাফরমানী করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যায় না। রাছূলের জন্মদিন কিংবা জন্মবার্ষিকী স্মরণে 'ঈদ উদযাপন বা মাহ্‌ফিল আয়োজন- এগুলো হলো রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর অবাধ্যতা ও নাফরমানীমূলক কাজ। কেননা, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন- তাঁর ছুন্নাহ্ এবং তাঁর পরে তাঁর খুলাফায়ে রাশিদাহ্‌র ছুন্নাহ্ অনুসরণ করতে। তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করতে। যেহেতু মীলাদুন্নাবী কিংবা মীলাদ পালন রাছূলুল্লাহ্ ﷺ কিংবা তাঁর খুলাফায়ে রাশিদাহ্‌র ছুন্নাহ্ ছিলনা বরং এটি দ্বীনে ইছলামের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নতুন আবিষ্কৃত একটি বিষয়। তাই এরূপ করা নিঃসন্দেহে রাছূলের (ﷺ) নাফরমানী এবং তাঁর নির্দেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم ছিলেন রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতি সবচেয়ে বেশি অকৃত্রিম সম্মান প্রদর্শনকারী। তাঁরা আল্লাহ্‌র রাছূলকে (ﷺ) কত বেশি সম্মান করতেন তার কিছুটা জানা যায় ক্বোরাইশদেরকে বলা 'উরওয়াহ্ ইবনু মাছ'ঊদ رضي الله عنه এর কথা থেকে। তিনি তাদের বলেছিলেন:- অর্থ- "হে আমার জাতি-গোষ্ঠী! আমি পারস্য ও রোম সম্রাটের দরবারে গিয়েছি, এছাড়া আরো অনেক রাজা-বাদশাহ্‌র দরবারে গিয়েছি, কিন্তু আমি এমন কোন রাজা-বাদশাহ্ দেখিনি যাকে তার সঙ্গী-সাথীরা এই পরিমাণ সম্মান প্রদর্শন করে, যে পরিমাণ সম্মান মুহাম্মাদের (ﷺ) সাথীবর্গ (সাহাবাগণ) মুহাম্মাদকে করে থাকেন। আল্লাহ্‌র শপথ! তাঁর (মুহাম্মাদ ﷺ এর) প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান পোষণ বশতঃ তাঁরা তাঁর দিকে চোঁখ তুলে তাকায় না"।

এতো শ্রদ্ধা পোষণ, এতো সম্মান প্রদর্শন সত্ত্বেও তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم) রাছূলের (ﷺ) মহান জন্ম স্মরণে মীলাদ মাহ্‌ফিল বা মীলাদুন্নাবী পালন করেননি। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রস্রাব-পায়খানার সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি ও একটি উপলব্ধি

অনুবাদ ও সংকলন: আবূ ছা'আদা হাম্মাদ বিল্লাহ্

প্রস্রাব-পায়খানার নিয়ম-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার আগে; মল-মূত্র ত্যাগের এই যে কর্মটি প্রতিটি আদম সন্তান অতি সহজে সম্পন্ন করে থাকে- এর অন্তরালে কী রয়েছে এবং এর রহস্যটা কী? সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। যাতে প্রতিটি মানুষ প্রত্যহ অনায়াসে ও বিনা খরচায় সম্পাদিত এ জটিল কর্মটির মূল রহস্য কিছুটা হলেও জানতে ও উপলব্ধি করতে পারে এবং এর নিয়ম-নীতিগুলো মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

আল্লাহ سبحانه وتعالى দৃশ্যমান ও অদৃশ্য, গোপনীয় ও প্রকাশ্য তাঁর অগণিত-অসংখ্য নি'মাহ্ (দয়া, করুণা, দান, অনুগ্রহ, অনুকম্পা) দিয়ে আমাদের পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। আমরা যা কিছু খাই বা পান করি, সেটাও কিন্তু আল্লাহ্‌র (عز وجل) অফুরন্ত নি'মাহ্-র অংশবিশেষ। পানাহারের মাঝে যেমন আল্লাহ্‌র (سبحانه وتعالى) নি'মাহ্ রয়েছে, তেমনি এর আগে-পরেও আল্লাহ্‌র (سبحانه وتعالى) অসংখ্য নি'মাহ্ রয়েছে, যেটাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। পানাহারের আগে যেসব নি'মাহ্ রয়েছে, তন্মধ্যে যেমন দেখুন:- আমরা যে পানি পান করে থাকি (সর্বপ্রকার পানীয়জাত দ্রব্যের- সেটা চা হোক, কফি হোক, শরবত বা জ্যুস যা-ই হোক না কেন, তার মূল উপাদান কিন্তু পানি-ই) তা কিন্তু আমরা আমাদের শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে উৎপাদন করিনি বা নিয়ে আসিনি। আল্লাহ عز وجل ইরশাদ করেছেন:- (৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রধান সম্পাদক: আবূ মাহ্‌দী। সহকারী সম্পাদক: মাহ্‌মূদ হাছান। ব্যবস্থাপক: মুজতাবা আর.বি। গ্রাফিক্স ও সার্কুলেশন ম্যানেজার: আবুল খাইর।
যোগাযোগ: ০১৭৮৭-১০৪৬২৬। প্রকাশনায়: "এসো দ্বীন শিখি" কর্তৃপক্ষ। www.eshodinshikhi.com/www.learnislaminbangla.com